মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি: নং- ১৪৫ বর্ষ-১, সংখ্যা-৮

সেপ্টেম্বর ২০১২ইং, শাওয়াল ১৪৩৩হি: شوال ١٤٣٣هـ، ستمبر ٢٠١٢م

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সার্কুলেশন ম্যানেজার

মাওঃ নাসির উদ্দীন

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

প্রচ্ছদ : চট্টগ্রাম বন্দরনগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জামি'আ মাদানিয়া (শুলক বহর মাদরাসা)-এর ছাত্রাবাসের একাংশ।

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।

ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮

ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com

ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে ৫
পবিত্র সুন্নাহ থেকে ৭
দরসে ফিক্বহ ৮
মুফতী শাহেদ রহমানী
হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর অমূল্য বাণী ১০
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মালফূযাতে ফক্বীহুল মিল্লাত ১১
মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ..... ১৩
মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব
মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-৫..... ১৭
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
কোয়ান্টাম মেথড-৫..... ২১
মুফতী শরীফুল আজম
মাতা-পিতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব... ২৬
মাওলানা কাজী ফজলুল করীম
মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)..... ২৮
আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩০
ইসলামে টুপির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ৩৪
মাওলানা রিজওয়ান জমীরাবাদী
প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-৩..... ৩৯
মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী
উদীয়মান কাফেলা ৪৩
খবরাখবর ৪৬

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক:০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১১৯১২৭০১৪০ সহকারী সম্পাদক: ০১৮১২৩৫৭৫২২
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯ সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৮৩১৭৪০৫৪০

সম্পাদকীয়

বেহায়াপনা ও নগ্নতার সয়লাব- ভয়াবহ গন্তব্যের পথে দেশ ও জাতি

রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কেয়ামতের যে সকল আলামত বিবৃত হয়েছে তার মধ্যে চোখ বুলালে বোঝা যায়, মানুষ অনেক চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর নাম প্রয়োগ করে বিভিন্ন মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়বে। মদ পান করবে; কিন্তু নাম পাল্টে দেবে। বিভিন্ন প্রকার অশ্লীলতায় জড়িয়ে যাবে কিন্তু নাম হবে ভিন্ন। শির্ক বিদআত ছড়িয়ে পড়বে, নাম হবে অন্য কিছু। এই পর্যায়টি হলো পাপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও মন্দ পন্থা। ভালো সাইনবোর্ডে মন্দের চর্চা। সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির প্রচলন। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নফসের গোলামী ইত্যাদি। ইসলামের প্রারম্ভকালে দুনিয়ার অবস্থা ছিল অনুরূপ। আরবগণ নিজেদেরকে দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী বলত, অথচ তারা সম্পূর্ণরূপে শির্কের সাথেই জড়িত ছিল।

কোনো মানুষ যখন পাপে অভ্যস্ত হয় এবং জেনেশুনে গোনাহ করে তখন সে উক্ত পাপকে বৈধ সাব্যস্ত করার পথ খোঁজে। পশ্চিমা জগৎ আজ এই পন্থাই অবলম্বন করে চলেছে। সর্বস্বীকৃত অসংখ্য মন্দ ও নিকৃষ্ট চরিত্র আজ আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যাঁরা এর বিরোধিতা করেন, এরূপ মন্দ কাজগুলোকে যাঁরা মন্দ বলেন তাঁদেরকে মৌলবাদী, একঘেয়ে, উগ্রপন্থী ইত্যাদি নাম ও উপনামে হেয়প্রতিপন্নও করা হয়। এরূপ মানবতা পরিপন্থী মন্দ কাজগুলো মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে।

এই ধারাবাহিকতায় একটি বড় ফিতনা হলো "অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা"র ফিতনা। যা উদারনীতি, মুক্তচিন্তা এবং সুশীল সমাজের নামে ছড়ানো হচ্ছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে নগ্নতা, অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। একে শয়তানের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى (النحل ٩٠)

"আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন।" (নাহাল ৯০)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বস্তু থেকে বাঁচার নির্দেশ দিচ্ছেন। (১) বেহায়াপনা (২) মুনকার বা অবৈধ কাজ (৩) অহংকার। বেহায়াপনা বলা হয়, যা মন্দের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে গেছে, যার মন্দের দিকটি আকল, বুঝ ও মানবপ্রকৃতির বিচারে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আর মুনকার বলা হয় ওই সকল কাজকে, যা অবৈধ ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

الشيطن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء (البقرة : ٢٦٨)

"শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।" (বাকারা-২৬৮)

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر- (النور ٢١)

"যে লোক শয়তানের অনুসরণ করে, শয়তান তো সব সময় বেহায়াপনা ও অবৈধ কাজের প্রতিই উৎসাহিত করে।"

فحشاء 'মুনকার' তথা 'অবৈধ' শব্দের মধ্যে منكر 'ফাহশা' তথা 'বেহায়াপনা'র অর্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে فحشاء 'বেহায়াপনা' শব্দটিকে পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু 'মুনকার' শব্দের আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, বেহায়াপনা হলো বহু অবৈধ কাজের কারণ। কোনো সমাজে বা রাষ্ট্রে অশ্লীলতা ব্যাপক আকার ধারণ করলে সেখানে লজ্জাহীনতা, পাশবিকতা, পাষণ্ডতা ব্যাপকতা লাভ করে। ধর্মীয় চেতনা-চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ইসলাম এবং ঈমানের শক্তি ও চিন্তা-চেতনা দুর্বল

"আল্লাহ তা'আলা ন্যায় পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি লজ্জাহীনতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন।" (নাহাল

হয়ে যায়। এমনকি গোনাহ ও পাপের ঘৃণা অন্তর থেকে হ্রাস পায়।

অন্যদিকে ইসলাম فحشاء তথা অশ্লীলতার বিপরীতে حياء তথা লজ্জাকে এতই গুরুত্ব দিয়েছে যে, একপর্যায়ে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ পর্যন্ত বলা হয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

الحياء شعبة من الايمان (صحيح مسلم ٧٥)

"হায়া বা লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। (মুসলিম ৭৫)

আরেক হাদীসে ইরশাদ করেন–

اذا لم تستحى فافعل ما شئت (ابو داؤد ، رقم الحديث ٤٧٧٧)

"যখন তোমার হায়া বা লজ্জা না থাকে তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করো।" (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৭)

গত কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তা অত্যন্ত বিভীষিকাময় এবং ভয়াবহ। এর প্রতিরোধ আবশ্যক। না হয় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার এই ভয়াবহ প্লাবনে পুরো দেশ ও জাতি নিমজ্জিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। অনৈসলামিক সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার বিস্তার কোনো নতুন কথা নয়। কোনো ইসলামী রাষ্ট্র আবার যে রাষ্ট্রের নব্বই শতাংশ জনসাধারণই মুসলমান, সেরূপ একটি মুসলিম দেশে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রসার নিশ্চয়ই যারপরনাই পরিতাপের বিষয়। প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যে কোম্পানিগুলো কর্তৃক নিজেদের প্রচার প্রসারের হাতিয়ার হিসেবে পণ্যের লেভেলে নারীদের অশ্লীল ও অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশ এতই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য–এমনকি ঘরোয়া জিনিসপত্রেও এখন ওই নগ্ন ছবির ছড়াছড়ি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কভার পেইজে ফিল্মি নায়িকা ও মডেলদের উলঙ্গ ও নগ্ন ছবি ছাপানো এখন সচরাচর বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঘাটতিটুকু পূরণ করছে টিভি এবং ফ্যাশনশোগুলো। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রসারের বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও মেশিনারিজ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইন্টারনেট ও মোবাইল কোম্পানিগুলোর নিত্যনতুন প্যাকেজ এসবকে ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রচণ্ডবেগে ধেয়ে আসা অশ্লীলতার ভয়ানক এই ধারা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন ছাপা হয় একটি বিদেশী পত্রিকায়। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, "অশ্লীলতার ব্যাপক প্রসার যদি ত্বরিত রোধ করা না যায় তবে প্রজ্জ্বলিত আগুন আমাদের সভ্য সমাজকেও গ্রাস করে নেবে। বর্বরতা ও অসভ্যতার ওই সীমানা মুসলিম দুনিয়াও ছুঁয়ে যাবে, যা পশ্চিমা সমাজে চারিত্রিক অধঃপতনের মূল কারণ। যেখানে পাশবিকতার এমন অবস্থা, বেশির ভাগ নবপ্রজন্মের পিতার পরিচয় মেলে না, নারী-পুরুষ বিয়ে ছাড়াই ঘর সংসার করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। বরং সমকামী বিবাহের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা এখন তাদের স্বাভাবিক জীবনে সচরাচর বিষয়ের রূপ নিয়েছে। একটি অমুসলিম ও কুফরী রাষ্ট্রে এরূপ বেহায়াপনা ও বর্বরতা ছড়িয়ে পড়া বড় আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু কোনো মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্রে এরূপ প্রবণতা সবল হলে, তা অত্যন্ত দঃখের এবং চিন্তার বিষয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হায়া তথা লজ্জাকে ইসলামের একটি শাখা বলেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরায়ে নূর ও সূরায়ে আহযাবে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নিজেদের নজর বা দৃষ্টি এবং ইজ্জতের হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদ্রুপ মুমিন রমণীদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে তাদের পোশাক কী হবে এবং কোন পন্থা অবলম্বন করে তারা ঘর থেকে বের হবে। সূরায়ে আহযাবে পর্দাহীনতাকে জাহেলিয়াতের ওই যুগের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যখন রমণীরা সেজেগুজে বাইরে আনাগোনা করত।"

লজ্জা ও পর্দাহীনতা সম্পর্কে এরূপ স্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রেও প্রায় সবক্ষেত্রে যে পরিমাণ উলঙ্গপনা, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা প্রসার লাভ করছে তার ধারা যদি এভাবে জারি থাকে তবে, পশ্চিমা বিশ্বের ন্যায় আমাদের সমাজও চারিত্রিক দিক থেকে অধঃপতনের সর্বনিম্নপর্যায়ে পৌঁছে যেতে বেশি সময় লাগবে না। আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের বৈশিষ্ট্যই হলো লজ্জা, নিপূণ চরিত্র, উন্নত আদর্শ। যদি আমরা এগুলোকেই হারিয়ে ফেলি তবে আমাদের আর কী বা বাকি থাকবে? এ সকল বৈশিষ্ট্যই তো আমাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে। আমরা যদি আমাদের এই বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষণ না করি এবং সব কিছুকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেই তবে আল্লাহ না করুন আমাদের সর্বস্ব হারিয়ে দিতে হবে, ওই লুহাওয়া আমাদের যথেচ্ছা উড়িয়ে নিয়ে ধ্বংসের চূড়ায় নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাজত করুন। আমীন।

আমাদের এহেন পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। যা বাস্তবায়ন করা হলে অন্তত আগামী প্রজন্ম আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই সয়লাব থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে।

১। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের ওপর প্রভাব

বিস্তারের শক্তি রাখে। প্রত্যেকে নিজের অধীনস্তদের ওপর এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে পারে। স্ত্রী, বোন, ভাই, ছেলেমেয়ে ও পরিবারের সদস্যদেরকে এ ধরনের অপসংস্কৃতি ও দুঃশ্চরিত্র থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক ঘরের বড় ও সচতেনদের দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং ঘরওয়ালাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।" ব্যক্তি সমাজের মাধ্যমে আর সমাজ ব্যক্তির মাধ্যমে সংশোধিত হয়। একটি সমাজ তার সদস্যের নৈতিক দায়িত্ব ছাড়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে খারাবি রোধের চেতনা জাগ্রত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে বেহায়াপনার এই ধারা রোধ করা সম্ভব হবে না।

২। ধর্মীয় কর্ণধারগণ জনসাধারণের মধ্যে এই চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করতে পারেন। মসজিদের ইমামগণ, ওয়া'য়েজীনে কেরাম, দাঈগণ পুরোপুরি আন্তরিকতার সহিত বেহায়াপনা ও দুঃশ্চরিত্রের পার্থিব ও পরকালীন ক্ষতি সম্পর্কে ওয়াজ ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদের পাশাপাশি পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন ও অন্যান্য মিডিয়া কর্তৃক বেহায়াপনার বিস্তার রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। প্রশাসনেরও এ ব্যাপারে দয়িত্ব অপরিসীম। প্রশাসন চাইলে যে সকল রাস্তা দিয়ে বেহায়াপনা বিস্তৃতি লাভ করছে সেগুলো বন্ধ করে দিতে পারে। বিশেষ করে প্রশাসন স্যাটেলাইট মিডিয়া, ইন্টারনেট কেবল এবং স্যাটেলাইট লাইনের প্রতি কড়া নজরদারি করলে ব্যাপকভাবে বেহায়াপনার বিস্তার অনেকটাই হ্রাস পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইন্টারনেটের ওপর কড়া নজরদারি থাকে। অনেক উন্নত বিশ্বেও বর্তমানে বাধ্য হয়ে ওসব মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কিছুদিন পূর্বে সরকার অশ্লীলতা রোধে আইন পাস করেছে। কিন্তু তা কতটুকু প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত হয়েছে জানা যায়নি। তবে এ কথা তো বলা যায় দেশে লাগামহীনভাবে বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করুক তা কারো কাম্য নয়। প্রশাসনও যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হয় তবে আমাদের বিশ্বাস, খুব অল্প সময়ে এই সয়লাব রোধ করা যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতিকে রক্ষার খাতিরে এই দিকটার প্রতি নজর দেওয়া সর্বস্তরের জনগণের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যাবতীয় ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে বর্তমান প্রজন্মকেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন

আরশাদ রহমানী
০২-০৯-২০১২

শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক্ব (রহ.)-এর ইন্তিকালে
মাসিক আল-আবরারের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান-এর শোকবার্তা

জাতি এক যোগ্য অভিভাবককে হারিয়েছে

উপমহাদেশের খ্যাতিমান হাদীস বিশারদ শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজীজুল হক (রহ.)-এর ইন্তিকালে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাতবারাকাতুহুম) এক শোক বার্তায় বলেন, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজীজুল হক (রহ.)-এর ইন্তিকালে পুরো জাতি এক যোগ্য অভিভাবককে হারিয়েছে। তিনি ইলমে নববী তথা হাদীস শাস্ত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁর বিশাল ইলমী খিদমাত মুসলিম উম্মাহের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, হযরত আল্লামা আজীজুল হক্ব (রহ.) বাংলাদেশের যে কোনো দুর্দিনে জাতির পাশে থেকে যে অবদান রেখে গেছেন, তা জাতি কখনও ভুলতে পারে না। তিনি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

হযরত ফক্বীহুলমিল্লাত (দা. বা.) হযরত শায়খুল হাদীস সাহেবের ইন্তিকালের খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। নিজের অসুস্থতা সত্বেও তিনি ত্বরিৎ মসজিদে গিয়ে তাহলীল, খতমে কুরআন ও দু'আ মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। নিজের পরিচালনাধীন ও অভিভাবকত্বে পরিচালিত মাদরাসাসমূহে তাহলীল, খতমে কুরআন ও দু'আর ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করেন, আল্লাহ যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, ভক্ত, অনুরক্ত, ছাত্রদের সবরের তাওফীক দান করেন।

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

قد افلح من تزكى☆ وذكر اسم ربه فصلى☆ بل تؤثرون الحيوٰة الدنيا☆ والاٰخرة خيروابقى☆ ان هذا لفى الصحف الاولى☆ صحف ابراهيم وموسى☆

"নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পবিত্রতা অর্জন করে ☆ এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে ☆ বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও ☆ অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ☆ এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ☆ ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে☆" (সূরা আল-আ'লা : ১৪-১৯)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের-মুশরিক, বেদীন, মুরতাদ ও হতভাগাদের অবস্থা ও ভয়াবহ পরিণতির আলোচনা করা হয়েছে।

আর এ আয়াতসমূহে ভাগ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য, কর্মসূচি এবং শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পবিত্রতা অর্জন করে, অন্তরকে আল্লাহ পাকের যাবতীয় নাফরমানী থেকে পবিত্র করে, গোমরাহীর অন্ধকার থেকে আত্মরক্ষা করে, মনকে হিংসা-বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা থেকে পবিত্র করে, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তার ধন-সম্পদকে পবিত্র করে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্র রাখে সেই সফলকাম হবে। শুধু তা-ই নয়; বরং "وذكراسم ربه فصلى" "আর তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে এবং যথানিয়মে নামায পড়ে, সেই সফলকাম হবে।" হযরত ইয়াকুব কারখী (রহ.) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আধ্যাত্মিক সাধনার' বিভিন্ন স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

(১) قد افلح من تزكى

দ্বারা তাওবা এবং আত্মসংশোধনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(২) وذكر اسم ربه فصلى

দ্বারা দরবারে এলাহীর দুর্লভ হাজেরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, নামায হলো মুমিনের মিরাজ। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "আমার নয়নের তৃপ্তি হলো নামায।

بل تؤثرون الحيوٰة الدنيا ☆ والاٰخرة خير وابقى☆

কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। আলোচ্য আয়াতে আখিরাত সম্পর্কে মানব জাতির গাফিলতীর সমালোচনা করা হয়েছে যে, তোমরা এ পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দাও, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের গুরুত্ব তোমাদের দৃষ্টিতে সর্বাধিক, আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে তোমরা গাফিল।

অথচ ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মূলত কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে,

والاٰخرة خير وابقى

আখিরাতের জিন্দেগী তার নিয়ামতসমূহ উত্তম ও চিরস্থায়ী। অর্থাৎ একটু চিন্তা করো যে, তোমরা কোন বস্তু ছেড়ে কোন বস্তু অবলম্বন করছো। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত: তা সুখ ও আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত: তার কোনো স্থিরতা ও স্থায়ীত্ব নেই। আজ যে বাদশা, কাল সে পথের ভিখারী। আজকের যুবক ও বীর্যবান, আগামী কাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনেই ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট। তদুপরি তা ابقى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। একমাত্র কোনো বোকা ও হতভাগাই আখিরাতের শ্রেষ্ঠ উত্তম ও চিরস্থায়ী নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

মুসনাদে আহমদে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "দুনিয়া ওই ব্যক্তির ঘর যার (আখেরাতে কোনো) ঘর নেই, দুনিয়া ওই ব্যক্তির সম্পদ যার (আখেরাতে কোনো) সম্পদ নেই এবং দুনিয়ার জন্য ওই ব্যক্তি (ধন-সম্পদ) জমা করে যার বিবেক-বুদ্ধি নেই।

হযরত আরফাজা সাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে

سبح اسم ربك الاعلى

এই সূরাটির পাঠ শুনতে চাচ্ছিলাম। যখন তিনি

بل تؤثرون الحيوٰة الدنيا

পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তিনি এর পাঠ ছেড়ে দিয়ে স্বীয়

সঙ্গীদের বললেন, “আমরা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। তাঁর এ কথায় উপস্থিত সকলে নীরব থাকলে তিনি বলেন, আমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে গেছি। দুনিয়ার সৌন্দর্য নারী, খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর আখিরাত আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রয়েছে। তাই আমরা আমাদের সামনের জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিয়েছি এবং দূরের জিনিস হতে চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছি। (ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ইমাম জারীর (রহ.))

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালোবেসেছে সে তার আখিরাতের ক্ষতি করেছে, আর যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভালোবেসেছে সে তার দুনিয়ার ক্ষতি করেছে। হে লোকসকল! যা বাকি থাকবে তাকে যা বাকি থাকবে না তার ওপর প্রাধান্য দাও।”

ان هذا لفى الصحف الاولى ، صحف ابراهيم وموسى

নিশ্চয়ই তা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে, ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

অর্থাৎ আত্মসংশোধনে, পবিত্রতা অর্জনে আল্লাহ পাকের স্মরণ, সদকা প্রদান এবং নামায আদায়ের যে কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে, তা নতুন কিছু নয়, বরং ইতিপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতি যে সহীফা এবং মুসা (আ.)-এর প্রতি যে, তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে তাতেও এ কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে। আর আয়াত সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ, আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের অত্যন্ত ফলপ্রসূ কর্মসূচি।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএল-এ পাঠানো হয়।
*	জেলা ভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২০% কমিশন দেয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রীম বা জামানত নেয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যে কোন সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	২০০	৩০০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৭২০	৯০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১০৮০	১২০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১২০০	১৪০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৫০০	১৭০০
#	আমেরিকা	১৭০০	২০০০

১বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

সম্মানিত গ্রাহকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রি ডাকই সকল গ্রাহকের জন্য উত্তম। কারণ সাধারণ ডাকে অনেক সময় ঠিকমত পত্রিকা পৌঁছে না।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীস গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

হাদীসের আলোকে শাওয়ালের ছয় রোযা

عن ابى ايوب الانصارى انه حدثه ان رسول الله ﷺ قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ (مسلم ٢/٨٢٢ رقم الحديث ١١٦٤)

"হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসে ৬টি রোযা রাখল তাহলে সে ব্যক্তির রোযা একযুগ তথা এক বছর সমপরিমাণ হবে।" (মুসলিম ২/২২৮ হাদীস নং ১১৬৪)

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কেরাম বলেছেন, صيام الدهر (এক যুগ সমপরিমাণ রোযা) এটা এজন্য যে, এক নেকীর বিনিময় হয় দশগুণ। তাই রমাজানের এক মাসের রোযার বিনিময়ে দশ মাসের সওয়াব হবে। আর শাওয়াল মাসের ৬দিনের বিনিময়ে দুই মাসের সওয়াব হবে। মোট ১২ মাস তথা এক বছরের সওয়াব হবে।

عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ يقول جعل الله الحسنة بعشر امثالها فشهر بعشر اشهر وصيام ستة ايام بعد الفطر تمام السنة (السنن الكبرى للنسائى ٢/١٦٣ رقم الحديث ٢٨٦١)

হযরত ছাওবান (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি নেকীকে দশগুন বৃদ্ধি করেন। সুতরাং রমাজানের এক মাস রোযা রাখার দ্বারা দশমাস রোযা রাখার সওয়াব হবে এবং ঈদুল ফিতরের পরে ছয়টি রোযা রাখার দ্বারা পূর্ণ এক বছর রোযা রাখার সওয়াব হবে। (ইমাম নাসায়ী ফীস সুনানিল কুবরা ২/১৬৩ হাদীস নং ২৮৬১)

سمعت جابر بن عبد الله الانصارى يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول : من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها۔ (مسند الامام احمد ٣/٣٠٨ رقم الحديث ١٤٣١٢)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমাজানের রোযা এবং শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখল সে যেন পূর্ণ এক বছরই রোযা রাখল। (মুসনাদে আহমদ ৩/৩০৮ হাদীস নং ১৪৩১২)

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من صام رمضان واتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (المعجم الاوسط ٨/٣٢٨ رقم الحديث ٨٦٢٢)

হযরত ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখল সে সদ্যভুমিষ্ট শিশুর ন্যায় গোনাহমুক্ত হয়ে গেল। (আল মু'জামুল আওসাত ৮/৩২৮ হাদীস নং ৮৬২২)

عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: من صام رمضان وستا من شوال فقد صام السنة (موارد الظمأن الى زوائد ابن حبان رقم الحديث ٩٢٨)

হযরত ছওবান (রা.)সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রমাজান মাসের রোযা ও শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন পুরো বছরই রোযা রাখল। (মাওয়ারিদুয যামআন হাদীস নং ৯২৮)

عن ابى ايوب صاحب النبى ﷺ عن النبى ﷺ قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر (ابو داود ٢/٨١٣ رقم الحديث ٢٤٣٣)

আবু আইয়ূব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রমাজানের রোযা রাখল, অতঃপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখল সে যেন এক যুগ (পূর্ণ বছর) রোযা রাখল। (আবু দাউদ ২/৮১৩ হাদীস নং ২৪৩৩)

হাদীসে বর্ণিত শাওয়াল মাসের ছয় রোযার ফজীলত অর্জনে মুরুব্বীগণ ছয় রোযার খুব গুরুত্ব দিতেন। এখনো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে ছয় রোযার গুরুত্ব বিদ্যমান, যদিও তা তুলনামূলক খুব কম। অথচ হাদীসে বর্ণিত ফজীলত হিসেবে এর গুরুত্ব আরো বেশি দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন মাদরাসা ও মাদরাসা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অবশ্য এর গুরুত্ব এখনও অটুট আছে। মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরায় শাওয়াল মাসে ছাত্রদের ভর্তির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরপরই সকল উস্তাদ ও ছাত্র সকলেই ছয় রোযা রাখেন। রমাজনের ন্যায় সকল উস্তাদ ও ছাত্রদের জন্য এক সাথে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ছয় রোযার সময়ও এক অনন্য মোবারক পরিবেশ এখানে লক্ষ্য করা যায়। বলতে গেলে, মারকাযে ছয় রোযার মাধ্যমে লেখা পড়া আরম্ভ হয় এবং বছরের শেষে শবেবরাতের রোযার মাধ্যমে শিক্ষা বর্ষের নিয়মিত দরস সমাপ্ত হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে হাদীসে বর্ণিত সওয়াব অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

দরসে ফিক্বহ

মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্ব ও উমরায় গমন

মুফতী শাহেদ রহমানী

হজ্ব ইসলামের পঞ্চম রোকন। এর ফজীলত অপরিসীম। হজ্বের মধ্যে আবদিয়্যাতের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। বান্দা আল্লাহর প্রেমে উন্মাদ হয়ে তাঁরই আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায় বাইতুল্লাহর চার পাশে। ছুটে বেড়ায় আরাফা, মুজদালাফাহ ও মিনার ময়দানে। সব ধরনের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একই পোশাকে সজ্জিত হয়ে জাতি, বর্ণ, ভাষার বাধা ডিঙ্গিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে ঘটে মুসলিম উম্মাহর মহামিলন।

ইসলামের এই মহান ইবাদত হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বিশ্বের সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারী খানায়ে কা'বার উদ্দেশ্যে মোবারক সফর করে থাকেন। তাই হজ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার পাশাপাশি মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্ব ও উমরায় গমন প্রসঙ্গে বক্ষমান সংখ্যায় আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হজ্বের হুকুম :

যার কাছে হজ্ব ওয়াজীব হওয়ার শর্তগুলো পরিপূর্ণ পাওয়া যাবে তার ওপর জীবনে একবার হজ্ব পালন করা ফরজে আইন। (আলে ইমরান আয়াতনং ৯৭, হজ্ব আয়াত নং ২৭, বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৮, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ১৬-১৯, বাদায়ে ৩/৪১)

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ :

একজন মুসলমানের ওপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যার মধ্য হতে যে কোনো একটি শর্তও যদি পাওয়া না যায় তাহলে হজ্ব ফরজ হবে না। এই ধরনের শর্ত মোট ছয়টি। নিম্নে শর্তগুলো সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণসহ প্রদত্ত হলো।

১। ইসলাম। অর্থাৎ মুসলমান হতে হবে। অতএব কোনো অমুসলিম যদি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজ্ব করে তাহলে তার হজ্ব আদায় হবে না। কারণ হজ্ব একটি মহান ইবাদত, আর অমুসলিম ইবাদতের যোগ্য নয়।

২। আক্বল। অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং অসুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি তথা পাগলের ওপর হজ্ব ফরজ নয়। এমনকি পাগল হজ্ব আদায় করলেও সর্বসম্মতিক্রমে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ সে ইবাদতের উপযুক্ত নয়। কোনো সময় সে সুস্থ হলে তাকে আবারও হজ্ব করতে হবে।

৩। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। অতএব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের ওপর হজ্ব ফরজ নয়। যদি তারা হজ্ব করে তাহলে তা নফল হবে। বালেগ হওয়ার পর হজ্ব ফরজ হওয়ার অন্য শর্তগুলো পাওয়া গেলে তাকে আবার হজ্ব আদায় করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, اذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل واذا عقل فعليه حجة اخرى অর্থাৎ বাচ্চার হজ্ব তার বালেগ হওয়া পর্যন্ত, অতঃপর যখন সে বালেগ হবে তখন তার ওপর আরেকটি হজ্ব আবশ্যক। (হাকেম ১/৪৮১)

৪। স্বাধীন হওয়া। অতএব অধীনস্ত গোলামের ওপর হজ্ব ফরজ নয়।

৫। হজ্ব ফরজ হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া। এ ক্ষেত্রে মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানই অবগতির জন্য যথেষ্ট। আর অমুসলিম রাষ্ট্রের অধিবাসী হলে দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা হজ্ব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তাকে খবর দিলেই হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে।

৬। সামর্থ্য থাকা। অথএব যে ব্যক্তি সামর্থ্যবান নয় তার ওপর হজ্ব ফরজ হবে না। কারণ কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا "যার কাছে বাইতুল্লাহর হজ্ব করার সামর্থ্য রয়েছে তার জন্য হজ্ব আদায় করা ফরজ। (আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)

☆ সামর্থ্যের ধরন :

যে সামর্থ্য হজ্ব ফরজ হওয়ার পূর্ব শর্ত তা দুই প্রকার।

১। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য শর্ত।

২। এমন সামর্থ্য যা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য শর্ত।

প্রথম প্রকারের সামর্থ্য যা পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য শর্ত তা চার প্রকার। যথা

১। বাইতুল্লাহ শরীফে আসা-যাওয়াসহ এই সময়ে নিজের পরিবারের যাবতীয় খরচের সামর্থ্য রাখা।

২। শারীরিক সুস্থতা। অর্থাৎ হজ্বের সফরের ক্ষেত্রে শারীরিক সব ধরনের প্রতিবন্ধকতামুক্ত হওয়া। অতএব অর্ধাঙ্গ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, প্যারালাইসিস আক্রান্ত ব্যক্তি, উভয় পা কর্তিত ব্যক্তি, বৃদ্ধ যে যানবাহনে আরোহনের সামর্থ্য রাখে না এবং কয়েদির ওপর হজ্ব ফরজ নয়।

৩। আসা যাওয়ার পথে জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া।

৪। সফর করে সময়মতো হজ্ব সম্পাদন

করার মতো সময় থাকা।

সামর্থ্যের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যে সামর্থ্য শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য শর্ত তা দুই প্রকার। এই শর্তদ্বয়ের মধ্যে কোনো একটি শর্তও যদি কোনো মহিলার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার ওপর হজ্ব ওয়াজীব নয়। বরং এমতাবস্থায় হজ্ব আদায় করা তারজন্য নাজায়েয হবে। যদিও তার মধ্যে উপরোল্লিখিত সব কয়টি শর্তাবলি বিদ্যমান থাকে। নিম্নে শর্তদ্বয় সবিস্তারে প্রদত্ত হলো।

১। স্বামী বা কোনো আমানতদার মাহরাম সাথে থাকা। অর্থাৎ কোনো মহিলা শরয়ী ৪৮ মাইল দূর থেকে হজ্বের সফর করতে চাইলে তার সাথে তার স্বামী বা অন্য কোনো এমন আত্মীয় থাকা হজ্ব ওয়াজীব হওয়ার পূর্ব শর্ত যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরস্থায়ীভাবে হারাম। হারাম হওয়ার কারণ চাই বংশীয় সম্পর্ক হোক। যেমন বাবা, ভাই, ছেলে বা দুধের সম্পর্ক হোক যেমন, দুধ-বাবা, দুধ-ভাই, দুধ-ছেলে। অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হোক যেমন শ্বশুর, জামাতা প্রমূখ।

হাদীসের আলোকে মহিলাদের মাহরাম ব্যতীত হজ্বে গমণ :

উপরোল্লিখিত আত্মীয়দের মধ্য থেকে কোনো এক শ্রেণীর আত্মীয় ব্যতীত মহিলাদের জন্য হজ্বে গমণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। এই মর্মে কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, সাবধান কখনো কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত হজ্বে গমণ করবে না। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৩০০৬, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪২৪, ১৩৪১)

২। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি যে, কোনো পুরুষ কখনও কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে না এবং কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। (ইবনে হিব্বান হাদীস নং ৩৭৬৩, ৩৭৬৪)

৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কোনো মহিলা তার স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না। (বুখারী, হাদীস নং ১৮৬৪, মুসলিম শরীফ হাদীস নং ৪১৫, ৪১৬, ৮২৭)

৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে নারী আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর ঈমান রাখে তার জন্য তিন দিন বা তার চেয়েও দূরত্বে তার বাবা, ভাই, স্বামী, ছেলে বা কোনো মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয হবে না। (আবু দাউদ হাদীস নং ১৭২৬, তিরমিযী হাদীস নং ১১৬৯)

☆ মাহরামের শর্তটি কোন প্রকারের?

হজ্বের সফরে নারীদের জন্য সাথে মাহরাম রাখা হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত, স্বশরীরে হজ্ব আদায় করা আবশ্যক হওয়ার জন্য নয়। এটি চার মাযহাবের বিশুদ্ধ মত। (বাদায়ে ৩/৫৪, আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ ১৬/৩৬)

মাহরাম কেমন হতে হবে?

হজ্বে মহিলার সফরসঙ্গী এমন আমানতদার মাহরাম হওয়া আবশ্যক, যে তার ইজ্জত-আবরোর ব্যাপারে নিরাপদ। সাথে সাথে সে সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং তার জন্য উক্ত মহিলাকে চিরস্থায়ীভাবে বিবাহ করা হারাম হওয়া। ইহা বংশীয় সম্পর্ক, দুধের সম্পর্ক বা বৈবাহিক যে কোনো সম্পর্কের কারণে হোক। (শামী ২/৪৬৪, আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ ১৬/৩৬)

মাহরামের খরচ কে বহন করবে?

হজ্বে মহিলার সফরসঙ্গী মাহরামের আসা-যাওয়ার সমুদয় খরচ উক্ত মহিলাকেই বহন করতে হবে। অতএব মাহরামের যাবতীয় ব্যয় বহনের সামর্থ্য থাকা মহিলার ওপর হজ্ব ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত। (শামী ২/৪৬৪)

২। তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারীনীর জন্য হজ্বের সফরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন, لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن "তোমরা তাদেরকে (ইদ্দত চলাকালীন মহিলাদেরকে) তাদের ঘর থেকে বের করো না এবং তারা নিজেরাও বের হবে না। (সূরা তালাক আয়াত নং ১) উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইদ্দত চলাকালীন মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া বা করা উভয়টি নাজায়েয। তা যে কোনো উদ্দেশ্যেই হোক।"

এই ব্যাপারে হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইদ্দত পালনকারী মহিলাদেরকে যুল হুলায়ফা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাদেরকে জুহফা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আরেকটি কারণ হলো হজ্ব অন্য সময় পালন করা সম্ভব, যা ইদ্দতের বেলায় অসম্ভব। (বাদায়ে ৩/৫৬-৫৭)

পরিশেষে কথা হলো, মুসিলম মা-বোনেরা হজ্ব ও উমরার গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিশেষভাবে তাদের জন্য প্রযোজ্য উল্লিখিত শর্তদ্বয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন না বা এই ব্যাপারে অবগত না হওয়ার কারণে এমনটি হয়ে থাকে। অতএব আমাদের প্রত্যেককেই এই ব্যাপারে সচেতন হওয়া একান্ত জরুরি।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবরারুল হক্ব হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

☆ নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি রাখা

হযরত ওয়ালা (রহ.) বলেন, দুনিয়াতে যত বিপদ-বিপর্যয় আসে সব নিজেদের গোনাহের কারণেই আসে। তাই প্রত্যেককেই এ কথা মনে রাখা দরকার, এসব যা কিছু ঘটছে আমাদের বদআমলীর কারণেই ঘটছে। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, নিজেদের দোষ-ত্রুটি দেখার পরিবর্তে অন্যদের দোষ-ত্রুটির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত বেশি করে থাকি। এক ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত। সে চলার পথে একটি আয়না রাস্তা থেকে উঠিয়ে তাতে নিজের মুখমণ্ডল দেখল। অতঃপর সে আয়নাকে সম্বোধন করে বলল, তুই এত কুৎসিত না হলে তোকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হতো না। অথচ আয়নাটি একেবারে পরিষ্কার ছিল। কুৎসিত তো তার মুখই ছিল। কিন্তু দোষ দিল আয়নার। এটাই আমাদের বর্তমান অবস্থার উদাহরণ। আমরা গোনাহের পর গোনাহ করে যাচ্ছি। এর পরও আমাদের ভেতর নিজের কোনো ত্রুটি অনুভূত হয় না, অপরকে দোষী এবং গোনাহগার মনে করে থাকি। অথচ সে দোষ-ত্রুটি নিজের মধ্যে বিদ্যমান। তাই নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

☆ ধর্মীয় কাজে এত অবহেলা কেন?

একটি ঘটনা, এক ব্যক্তি হযরত ওয়ালাকে বললেন, আজ একটি বিবাহের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেখানে দুইটি শরীয়ত বিরোধী রসম দেখতে পেলাম। একটি হলো, ফটো তোলা। দ্বিতীয়টি হলো, বাদ্যবাজনা। এ কথার ওপর হযরত বললেন, যখন ফটো তোলা হয় তখন আপনি আপনার মুখের ওপর কাপড় দিতেন এবং যখন বাদ্যবাজনা হচ্ছিল তখন নিজের কান বন্ধ করে নিতেন। তখন ওই ব্যক্তি বললেন, সব লোকের সামনে আমি এ ধরনের আচরণ করলে তো হেয়প্রতিপন্ন হতাম। হযরত ওয়ালা উদাহরণস্বরূপ বললেন, আপনি যদি কোনো বরযাত্রায় গিয়ে থাকেন এবং সেখানকার নিয়ম হলো যে, কোনো মেহমান এলে প্রথমে চাটনি খাওয়ানো হয়। তারপর অন্যান্য মেহমানদারী করা হয়। আপনাকে তাঁরা নিজেদের রসম হিসেবে একটি উন্নত পেয়ালা রোপার জরি লাগানো অবস্থায় অল্প চাটনি আপনার সামনে পেশ করলেন আর আপনি জিজ্ঞেস করলেন এসব কী? তাঁরা বললেন, এসব আমাদের একটি প্রথা। আপনি খান। আপনি বললেন, আরে ভাই বলেন তো কিসের চাটনি। তখন তাঁরা বললেন, এসব মাছির চাটনি। এখন আপনি বলেন! আপনি কি ওই চাটনিগুলো খাবেন? ওই ব্যক্তি বললেন, আমি তো কোনো অবস্থাতেই ওই চাটনি খাব না। বরং ওই জায়গা থেকে উঠে চলে আসব। তাঁর এহেন উত্তর শুনে হযরত বললেন, দুনিয়ার বিষয়ে আপনি উঠে চলে আসবেন আর ধর্মের বিষয়ে বলেন যে, আমি হেয়প্রতিপন্ন হব। এটা কেমন কথা।

☆ মুসলমানের প্রতিটি আমল সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া উচিত :

হযরত ওয়ালা (রহ.) বলেন, মানুষ সৃষ্টির সেরা, তাই স্বভাবগতভাবে মানুষ ভালো এবং উন্নত বস্তু কামনা করে। যখন কোনো মালামাল কিনতে বাজারে যায় তখন ভালো ও উত্তম জিনিসই পছন্দ করে। যেমন কলা, পেয়ারা, কাপড় এমনকি সব কিছুই উত্তম নিতে চেষ্টা করে। এ ধরনের কামনা থাকা খারাপ নয়, বরং ভালো কথা। কিন্তু এ ধরনের আচরণ ধর্মের ব্যাপারেও হওয়া দরকার। তাই আমাদের নামায, আযান, কুরআন তেলাওয়াত, রোযা, অজু সব আমলই উন্নত হওয়া দরকার। যাতে আমরা উন্নতমানের মুসলমান হতে পারি। কিন্তু বর্তমানে অবাক লাগে, পঞ্চাশ বছর ধরে নামায আদায় করে আসছে, অথচ নামাযের সুন্নাতসমূহ, অজুর সুন্নাতসমূহ পর্যন্ত জানা নেই। যখন অজু-নামায সুন্নাত মতো নয় তখন অন্যান্য বিষয়ের কী অবস্থা হবে তা থেকে বুঝে নেওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যেক লোককে সুন্নাতের দিকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। সুন্নাতের অনুসরণে আমল উন্নত হয়। তাই এক একটি সুন্নাত শিক্ষার ব্যবস্থাগ্রহণ করা প্রয়োজন।

☆ মুস্তাহাবের গুরুত্ব দেওয়া জরুরি :

হযরত ওয়ালা (রহ.) বলেন, সুন্নাতের সাথে সাথে মুস্তাহাবের গুরুত্ব দেওয়াও প্রয়োজন। মুস্তাহাবের মাধ্যমে সুন্নাতের ওপর পরিপূর্ণ আমল হয়। এবং বিশেষ বরকত এবং ফায়দা অর্জিত হয়। যেমন টাখনোর উপরিভাগে লুঙ্গি-পায়জামা রাখা সুন্নাত। কিন্তু আরো কিছু উপরে পরিধান করা মুস্তাহাব। এখন যদি মুস্তাহাবের ওপর আমল না করে শুধু সুন্নাতের ওপর আমল করা হয় তবে কোনো সময় লুঙ্গি বা পায়জামা নিচে নেমে গেলে তা হারামের পর্যায়ে চলে যাবে, টাখনো ঢেকে যাওয়ার কারণে। তবে মুস্তাহাবের ওপর আমল করা অবস্থায় লুঙ্গি বা পায়জামা কিছু নিচে নেমে গেলেও সুন্নাতের পর্যায়ে থাকবে।

অনুবাদ : **মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল**
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ,

মালফূযাতে

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম-এর বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনের উদ্দেশে এবং বিভিন্ন মাহফিলে দেওয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মাওয়ায়েয ও বয়ান থেকে সংগৃহীত)

☆ হযরত বলেন, ধন দৌলত আসমান থেকেই আসে। কিন্তু সব উপরের দিকে যায় না। অনেক কিছু নিচে থেকে যায়। কারূনকে অনেক ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছিল। যার ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ বেশ কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তির গুরুবোঝা হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা তার ধন দৌলত নিচের দিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত নিচের দিকেই যেতে থাকবে। পক্ষান্তরে হযরত ওবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) ও বড় মালদার ছিলেন। যার ঘোড়া বাঁধার খুঁটি ছিল স্বর্ণের। হয়ত খুঁটির প্রলেপ স্বর্ণের ছিল। কেননা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য খালেস স্বর্ণের ব্যবহার জায়েয নেই। শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয আছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের কোনো পুরুষের জন্য স্বর্ণের ব্যবহার হালাল নয়। একদা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (রা.) কে বললেন, যখন মুসলিম বাহিনী রোম রাজ্য বিজয় করবে তখন তোমাকে রোমের বাদশাহের হাতের চুড়ি পরানো হবে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.)-এর যামানায় যখন রোম রাজ্য মুসলমানদের হাতে বিজিত হয় তখন গনিমতের মালের তালিকা হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পেশ করা হয়। দেখা গেল তালিকায় চুড়ির উল্লেখ নেই। তখন উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, চুড়ি কোথায়? মুসলিম মুজাহিদগণ জবাব দিলেন, আমরা তালিকায় উল্লিখিত মালসমূহ পেয়েছি। আর বায়তুল মালে শুধু তাই মজুদ আছে। হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিলেন, বায়তুল মালে তালাশ করে দেখ। তালাশ করার পর বাদশার হাতের চুড়ি পাওয়া গেল। হযরত উমর (রা.) সেই চুড়ি নিয়ে হযরত মালিক ইবনে হুওয়াইরিসের হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন, যেহেতু আমি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে শুনেছি "যখন রোম রাজ্য মুসলমানদের হাতে আসবে তখন বাদশার হাতের স্বর্ণের চুড়ি আপনাকে পরিয়ে দেয়া হবে।" তাই আপনাকে পরিয়ে দিলাম। তবে এই চুড়ি যেহেতু স্বর্ণের, যা মুসলিম পুরুষের জন্য হালাল নয়, তাই তা আপনি খুলে ফেলুন। তখন সাহাবী চুড়ি হাত থেকে খুলে দিলেন। যাই হোক হযরত উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) বড় ধন দৌলতের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ধন দৌলত উপরের দিকে গিয়েছিল।

☆ হযরত মুফতী সাহেব হুজুর বলেন, একদা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ইমামে রব্বানী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছে একজন গোয়েন্দা পাঠানো হলো, হযরতের আয়ের উৎস সম্পর্কে জানতে। ওই গোয়েন্দা গঙ্গুহ এসে হযরত (রহ.)-এর কাছে বায়'আতের দরখাস্ত পেশ করে। জবাবে হযরত বললেন, এত তাড়াহুড়া কিসের? এখানে কিছুদিন থাক। পরে দেখা যাবে। এভাবে সে লাগাতার ছয় মাস পর্যন্ত ছিল। এত দিনের সোহবতের ফলে তার মধ্যে বাহ্যিক পরিবর্তন তো দেখা গেল। কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো না হওয়ার কারণে অন্তরে পরিবর্তন আসেনি। এরপর সে গঙ্গুহ থেকে চলে আসার ইচ্ছায় ইমামে রব্বানী হযরত গঙ্গুহীর (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলতে লাগলো, হযরত! আমি সরকারের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা হিসেবে এসে ছিলাম, আপনি কেমনে চলেন? আপনার আয়ের উৎস কী? তা জানার জন্য। কিন্তু আমি এত দিন ছিলাম, কিছুই জানতে পারলাম না। এখন আমি সরকারকে কী জবাব দেব? তখন হযরত বললেন, ভাই! আল্লাহ পাক চালান। অতঃপর সে বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর তার মনে এল, এত দিন হযরতের কাছে থেকে খাওয়া-দাওয়া করলাম এবং রাত কাটালাম, একটা পয়সাও তো দিলাম না। সাহারানপুর যেহেতু গোয়েন্দা অফিস আছে সেখান থেকে তো টাকা নিতে পারব। এই খেয়াল করে সাহারানপুর পর্যন্ত পৌঁছার গাড়ি ভাড়া হিসাব করে রেখে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে সে গোয়েন্দা লোক হযরত গঙ্গুহী (রহ.)-এর নিকট ফিরে এসে বলল, হুজুর! এই টাকাগুলো আপনার জন্য হাদিয়া। তখন হযরত গঙ্গুহী (রহ.) বললেন, দাও। টাকা নেওয়ার পর তাকে বললেন, আচ্ছা বলো আমি কি তোমাকে টাকার কথা বলেছি? আমার কোনো লোক কি তোমাকে টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। তাহলে তুমি কেন টাকা দিতে এলে? দেখলে আল্লাহ

পাক আমাদের কিভাবে চালান? এভাবেই আল্লাহ পাক আমাদের চালান!

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, হযরত উবায়দুল্লাহ আহরার (রহ.) এত বড় ধনী ছিলেন, যার ঘোড়া বাঁধার খুঁটি ছিল স্বর্ণের প্রলেপবিশিষ্ট। প্রশ্ন আসে এত ধন-সম্পদ তিনি কিভাবে পেলেন? যেহেতু তিনি বড় বুযুর্গ ছিলেন, হাদিয়াও বেশি পেতেন। এখন আমরা কিভাবে চলব? মুসলমান ভাইদের হাদিয়ার মাধ্যমেই চলব। তবে হাদিয়া সহীহ তরীকায় হতে হবে। হযরত থানভী (রহ.)-এর নসীহত সামনে থাকা চাই। হযরত বলেন, হাদিয়া দেওয়া-নেওয়ার পূর্বে মুনাসাবাত তথা ভালো সম্পর্ক তৈরি হওয়া আবশ্যক। মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পর হাদিয়া দেবেন। অনেক (বন্ধুবান্ধব) দোস্ত আহবাব মুনাসাবাত ছাড়াই হাদিয়া নিয়ে আসেন। দিল সে হাদিয়া গ্রহণ করতে চায় না। তবে যেহেতু মুহাব্বতে দিয়ে থাকেন তাই না নিলে মনে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় নিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো আর দিল থেকে (সন্তুষ্টচিত্তে) নেওয়া হয় না। অনেক সময় এরূপ লোকের কাছ থেকে হাদিয়া গ্রহণও করা হয় না। মাদরাসায় আসা-যাওয়া করুন। জুম'আর দিন বাদ আসর দ্বীনি কথাবার্তা ও দু'আর মাহফিলে অংশগ্রহণ করুন। অতঃপর জানাশোনা ও মুনাসাবাত তৈরি হওয়ার পর হাদিয়া বা মাদরাসার জন্য দান করুন। তখন ইনশাআল্লাহ খুশি খুশি গ্রহণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি হঠাৎ এসে জানাশোনা ও মুনাসাবাত ছাড়া হাদিয়া দিতে চায় এর দ্বারা তার কী ফায়দা? এলেন অতঃপর হাদিয়া দিয়ে চলে গেলেন। পুরনো দোস্ত আহবাবের হাদিয়া সব সময় কবুল করা হয়। যেহেতু তাদের সাথে মুনাসাবাত তৈরি হয়ে গেছে।

☆ হযরত ওয়ালা বলেন, ইয়াকীন (পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস)-এর সাথে দু'আ করুন। আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। কে বলেছে দু'আ কবুল হয় না। দুআ নিয়মিত করতে থাকুন যখন কবুলিয়্যাতের সময় এসে যাবে তখন কবুল হয়ে যাবে। এখনও দু'আর পরিমাণ কবুল হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি। যখন স্তরে পৌঁছে যাবে তখন কবুল হবে। পাকিস্তান আমলে কাউকে কুকুর কামড় দিলে মিউনিসিপ্যালের পক্ষ থেকে চৌদ্দটি ইনজেকশন পুশ করা হতো। একটি বাকি থাকলেও কুকুরের জীবাণু-বিষ রয়ে যেত। দু'আর ব্যাপারটাও সেই রকম। যখন দু'আ করার পরিমাণ কবুলিয়্যাতের স্তরে পৌঁছে যাবে তখন অবশ্যই দু'আ কবুল হবে।

☆ জুম'আর দিন বড়ই মোবারক। বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবার সাথে সাথে বরকতময় দিন শুরু হয়ে যায়। জুম'আর দিন নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ আমল না থাকলেও কিছু আমল বেশি পরিমাণে করা যায়। তা জুম'আর দিন করার দ্বারা বিশেষ ফজীলত হাসিল হয়। যেমন দরূদ শরীফ বেশি পড়ার এহতেমাম (চেষ্টা) করা। চলতে ফিরতে ও দাঁড়াতে বসতে পড়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করল, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন।

☆ হযরত মুফতী সাহেব হুজুর বলেন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোনো আলেম শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)-এর মধ্যস্থতা ব্যতীত হাদীস বয়ান করতে পারবে না। অত্র এলাকার যে কোনো ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করতে চাইলে তাকে শাহ সাহেব (রহ.)-এর সনদে হাদীস বর্ণনা করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত হাদীসের সনদ পৌঁছানো ব্যতীত কোনো ব্যক্তি "মাওলানা" হতে পারে না। আপনি যাকে ইচ্ছা মাওলানা বলতে পারবেন না। বরং আপনাকে দেখতে হবে ওই ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত হাদীসের সনদ পৌঁছাতে পারে কি না? যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তাকে মাওলানা বলা হবে। অন্যথায় নয়। অনেক তালেবে ইলম মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয় কিন্তু হাদীসের জামা'আত পড়তে পারেনি। তাই সে মাওলানা হিসেবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে একজন দুর্বল তালেবে ইলম যদি হাদীসের জামা'আত পড়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত হাদীসের সনদ পৌঁছাতে পারে, সে ওই মেধাবী তালেবে ইলমের চেয়েও উত্তম ও মর্যাদার অধিকারী। সাথে সাথে তাকে মাওলানাও বলা হবে।

☆ হুজুর বলেন, কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষায় হাদীস শরীফের অনুবাদ পড়লে আপনি তাকে মাওলানা বলতে পারবেন না। যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর পড়লে আপনারা তাকে মুফাসসির বলেন না। বাস্তব অর্থে বাংলাদেশে কোনো মুফাসসির নেই। সবাই অতীতের মুফাসসিরদের বর্ণনা ও উক্তি নকল করেন। হ্যাঁ, যদি কাউকে মুফাসসির বলতে হয় "তাফসীরে নূরুল কুরআনের" লেখক মাওলানা আমীনুল ইসলাম সাহেবকে বলা যায়। তবে তাঁর তাফসীরেও কিছু ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। যার ওপর নজরে ছানি ও সম্পাদনা খুবই প্রয়োজন।

গ্রন্থনায় :

মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান

"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ-২

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক্ব

রাসূল (সা.)-এর যুগে ক্বিয়াস, ইজতিহাদ ও তাকলীদ :

ইসলামী শরীয়তের চার উৎস–কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের পরিচিতিমূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা কিয়াস সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করতে চাই। কুরআন ও সুন্নাহর শরয়ী দলিল হওয়ার বিষয়টি একমাত্র মুলহিদ ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। ইজমা দলিল হওয়ার ব্যাপারেও উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তর অংশের মতৈক্য রয়েছে। কিয়াসের ব্যাপারটিও তাই। কিন্তু মাযহাবের নিরাপদ গণ্ডিতে শরীয়ত অনুসরণকারীদের হেনস্থা করতে সুযোগসন্ধানীরা কিয়াসকে মোক্ষম হাতিয়ার মনে করে। তারা বলতে চায়, মাযহাবসমূহ বিশেষত হানাফী মাযহাব কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক নয়; মাযহাবের উৎস হলো কিয়াস। তাদের এ বক্তব্য নিছক মুর্খতাপ্রসূত কিংবা পরিষ্কার হঠকারিতা। শরীয়তের আইন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা যার আছে তিনিও জানেন, দলিল চতুষ্টয়ের মধ্যে কিয়াসের ধারাক্রম চতুর্থ নম্বরে। অর্থাৎ উদ্ভূত কোনো সমস্যার সমাধান ধারাক্রম অনুযায়ী কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় পাওয়া না গেলে তখনই কেবল কিয়াসের আশ্রয় নেয়া যায়। তাও এ শর্তে যে, কিয়াসটি প্রথমোক্ত তিন দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হতে হবে। তবে শরীয়তের জ্ঞানে বুৎপত্তি নেই এমন ব্যক্তির নিকট কিয়াসলব্ধ সিদ্ধান্তকে ক্ষেত্র বিশেষে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা পরিপন্থী মনে হতে পারে; কিন্তু বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিয়ে খতিয়ে দেখলে তার কাছেও সেটা পরিষ্কার কুরআন, সুন্নাহ সংগত প্রতিভাত হবে। কিয়াস যে, শরীয়তের অন্যতম দলিল তা অনস্বীকার্য। এতদসংক্রান্ত সন্দেহ-সংশয়ের নিরসনে আমরা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে সংঘটিত কিয়াস ও ইজতিহাদ নিয়ে আলোচনা করব।

জানা দরকার, কিয়াস মূলত ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত; ভিন্ন কিছু নয়। কারণ রায় বা ইজতিহাদ বলা হয় নব উদ্ভাবিত বিষয়ের বিধান শরীয়তের মূল ভাষ্য কুরআন, সুন্নাহ থেকে সাহাবা তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের পদ্ধতিতে উদ্ঘাটন করা। তাঁদের পদ্ধতি হলো বিধান বিষয়কে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত বিধান জ্ঞাত অনুরূপ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করে জ্ঞাত বিধানটিকে অজ্ঞাত বিষয়ের ওপর আরোপ করা। আর এটাই কিয়াস।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইজতিহাদ :

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট ওহীর আগমন সত্ত্বেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ করে বিধান জারি করেছেন। হাদীস, সীরাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত -১ :

ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থান আল্লাহ তা'আলার হুকুমে, না আপনার ব্যক্তিগত মতের ভিত্তিতে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা আমার নিজস্ব মতামত। হুবাব ইবনুল মুনযির (রা.) বললেন, আমার মতে আপনি শত্রুপক্ষের আগমনের পূর্বে বদরের পানি বিশিষ্ট অংশে ছাউনি ফেলুন। যুদ্ধকৌশল উপযোগী এ মত শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি একটি উত্তম পরামর্শ দিয়েছো। তারপর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে অনুযায়ী ছাউনি ফেললেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/২৮০, সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৩২, উসূলুল জাসসাস ২/২০৮-২০৯) এখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথমে নিজ রায়ের ভিত্তিতে একটি স্থান নির্বাচন করলেন, তারপর হুবাব (রা.)-এর মতামত শুনে সেটাকে স্বীয় দ্বিতীয় ইজতিহাদ দ্বারা প্রাধান্য দিলেন।

দৃষ্টান্ত -২ :

মক্কাবাসীরা বদর যুদ্ধের মুক্তিপণ পাঠাল। রাসূল তনয়া হযরত যায়নাব (রা.) স্বামী আবুল আসের (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) মুক্তিপণ হিসেবে একটি হার পাঠালেন। হারটি যায়নাবের বিবাহের সময় হযরত খাদিজা (রা.) উপহার দিয়েছিলেন। খাদিজা (রা.)-এর স্মৃতিবহ হারটি নবীজিকে পুরনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন–

ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا۔

তোমরা ভালো মনে করলে যায়নাবের খাতিরে তার বন্দিকে ছেড়ে দিতে পারো এবং হারটি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারো। নবী অন্তঃপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন, কেন নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

অতঃপর তারা আবুল আসকে ছেড়ে দিলেন এবং হার যায়নাব (রা.)-এর নিকট ফিরিয়ে দিলেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩২৭)

এখানেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফিদয়া নিয়ে বন্দিমুক্তির ব্যাপারটি নিজ ইজতিহাদের মাধ্যমে করেছেন। কারণ মুক্তিপণ নেয়া আল্লাহর বিধান হলে সেখানে কাউকে ছাড় দেয়ার প্রশ্নই আসত না। অপরদিকে যায়নাবের ব্যাপারে আলাদা বিধান হলে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শেরও প্রয়োজন হতো না।

দৃষ্টান্ত -৩ :

খন্দক যুদ্ধের সময় আরবের সর্বজাতি নিজেদের শক্তি নিয়ে মদীনা অবরোধ করে বসল। অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবং দুঃখ-কষ্ট অসহনীয় হয়ে ওঠায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাবতে লাগলেন, না জানি আনসারগণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েন। তাই তিনি মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশের বিনিময়ে গাতফানীদের নিকট অবরোধ তুলে নেয়ার শর্তে সন্ধি প্রস্তাব করলেন। উভয় পক্ষ সম্মত হলো এবং সন্ধিপত্র লেখা হলো। কেবল স্বাক্ষরিত হওয়াই বাকি ছিল। অবশিষ্ট কাজটুকু করার পূর্বে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসার সরদার সা'দ ইবনে মু'আয ও সা'দ ইবনে উবাদা (রা.)কে ডেকে বিষয়টি তাদেরকে অবহিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন। উভয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটাকি আমাদের কল্যাণার্থে আপনার নিজের প্রস্তাব, না আল্লাহ আপনাকে এ জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, যা আমাদেরকে করতে হবে?" অন্য বর্ণনামতে তাদের প্রশ্ন ছিল, "এটা আপনার মতামত নাকি ওহী?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা আমার নিজের উদ্যোগ। কারণ, আমি দেখছি গোটা আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে এবং সবদিক দিয়ে তোমাদের ওপর দুর্লংঘ্য অবরোধ আরোপ করেছে। তাই যতটা পারা যায় আমি তাদের শক্তি চূর্ণ করতে চাচ্ছি।

হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রা.) বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইতিপূর্বে আমরা এবং এসব লোক শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলাম। তখন আমরা আল্লাহকে চিনতাম না এবং আল্লাহর ইবাদাত করতাম না। সে সময় তারা মেহমানদারী অথবা বিক্রয়ের সূত্রে ছাড়া আমাদের একটা খোরমাও খেতে পারেনি। আর আজ আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে ইসলামের গৌরব ও সম্মানে ভূষিত করেছেন, সত্যের পথে চালিত করেছেন, তখন তাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ দিতে হবে? আল্লাহর কসম আমাদের এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম! তরবারির আঘাত ছাড়া তাদেরকে আমরা আর কিছুই দিব না। এভাবেই আল্লাহ তাদের ও আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বুঝতে পারলেন, আনসারগণ ভগ্নোৎসাহ হওয়ার পাত্র নন। বললেন, "বেশ তাহলে এ ব্যাপারে তোমার মতই মেনে নিলাম।" এর পর হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) চুক্তিপত্রখানা হাতে নিয়ে সমস্ত লেখা মুছে ফেললেন এবং বললেন, ওরা যা পারে করুক। (সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/২৪৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১১৩)

এই ঘটনায়ও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিজস্ব ইজতিহাদ পরিলক্ষিত হলো। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম ইজতিহাদটি তরক করে দ্বিতীয় ইজতিহদটি গ্রহণ করলেন।

দৃষ্টান্ত-৪ :

একবার হযরত আলী (রা.) নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কোথাও কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠালে সে ক্ষেত্রে আমি কি সীলমোহরকৃত মুদ্রার ন্যায় হবো নাকি প্রত্যক্ষদর্শী হবো যে, সব কিছু নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করব? অর্থাৎ আপনি যেভাবে বলে দিয়েছেন হুবহু সেভাবেই করব, নাকি অবস্থা বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তুমি বরং প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় হবে যে এমন অনেক বিষয় লক্ষ্য করে, যা অনুপস্থিত ব্যক্তি করে না। (মুসনাদে আহমদ ৬২৮)

এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রা.)কে পরিস্থিতি দেখে বিবেচনা করে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন। এরই নাম ইজতিহাদ।

দৃষ্টান্ত-৫ :

বারীরা নাম্নী এক মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাঁদী ছিল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.) কে বারীরাকে আযাদ করে দিতে বললেন। বরীরার স্বামী মুগীছও ছিল এক ব্যক্তির গোলাম। আযাদ করার পর বিধিমতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারীরাকে তার পূর্ব স্বামী মুগীছ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে স্বামী রূপে গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার দিলেন। মুগীছ ছিলেন কালো বর্ণের অসুন্দর পুরুষ। কাজেই বরীরা মুগীছকে স্বামীরূপে গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিল। এদিকে মুগীছ ছিলেন বারীরার প্রতি সীমাহীন আসক্ত। তিনি বারীরার পেছন

পেছন মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে কেঁদে বুক ভাসাতেন। কিন্তু বারীরা ছিল নিজ সিদ্ধান্তে অনড়। একপর্যায়ে ব্যাপারটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেও ভাবিয়ে তুলল। তিনি বারীরাকে বললেন, "তুমি যদি আবার মুগীছকে গ্রহণ করতে!" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? নবীজি বললেন, না আমি তো সুপারিশ করছি মাত্র। বারীরা বলল, তাহলে তার ব্যাপারে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। (বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৫২৮৩)

এই ঘটনায়ও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজতিহাদ লক্ষ্য করা গেল।

এ ছাড়া নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্পর্কে চাষাবাদ, চিকিৎসা ও ওষুধ ব্যবহার-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে তিনি ইজতিহাদ ও রায় দ্বারা ফায়সালা করেছেন। (উসূলুল জাসসাস ২/২২৪)

কিয়াস অস্বীকারকারী বন্ধুরা উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে নিজেদের চিন্তাভাবনা পুনর্বিবেচনা করার যথেষ্ট উপকরণ পেয়ে যাবেন আশা করি। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা। অবশ্য এটুকুতে ক্ষান্ত না করে কিয়াসের সপক্ষে আমরা আরো কিছু প্রমাণ পেশ করছি।

উলামা সাহাবাদের প্রতি ইজতিহাদের নির্দেশ :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আর তাদের নিকট যখন কোনো বিষয়ের সংবাদ পৌঁছে, নিরাপত্তার হোক বা ভয়ের হোক, তারা (যাচাই না করে তৎক্ষণাৎ) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি এটাকে রাসূলের ওপর এবং তাদের মধ্যে যারা এরূপ বিষয় বুঝতে সক্ষম তাদের ওপর সমর্পন করত তবে তাদের মধ্যে যারা সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। (সূরা নিসা ৮৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বের হয় যাতে অবশিষ্ট লোক দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম (অর্থাৎ জিহাদে যোগদানকারীদেরকে নাফরমানী) হতে ভয় প্রদর্শন করে, যখন জিহাদকারীরা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে যেন তারা পরহেয করে চলে। (সূরা তাওবা ১২২)

এ ছাড়া আরও বহু আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাত অর্থাৎ দ্বীনের পরিপক্ব গভীর জ্ঞান অর্জন করে মাসায়েল বের করার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের বাণী :

☆ হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, বিচারক যখন ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব, আর যদি তার ইজতিহাদে ভুল হয় তার জন্য রয়েছে ইজতিহাদের ছওয়াব। (বুখারী শরীফ ৭৩৫৯, মুসলিম শরীফ ২৬৫৬)

☆ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) কে ইয়ামান প্রেরণের প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কোনো বিচার এলে তুমি কিভাবে তার ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, কিতাবুল্লাহ দ্বারা ফায়সালা করব। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যদি কিতাবুল্লায় না পাও? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ দ্বারা। বললেন, যদি কিতাবুল্লাহ এবং রাসূলের সুন্নাহেও না পাও? তিনি বললেন, আমার রায় দ্বারা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত দেব এবং এতে কোনোরূপ ত্রুটি করব না। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (খুশিতে) তার সিনায় চাপ মেরে বললেন, আল্লাহ তা'আলারই সকল প্রশংসা যিনি রাসূলুল্লাহর দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন, যা রাসূলুল্লাহকে সন্তুষ্ট করে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ ৩৫৯২)

☆ হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাঁকে তাফাক্কুহ ফিদ দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের গভীর বুৎপত্তি দান করেন। (বুখারী শরীফ ৭১, মুসলিম শরীফ ১০৩৭)

☆ হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, জ্ঞানের অনেক বাহক আছে যে তার চেয়ে বেশি বোঝে এমন কারও নিকট ইলম পৌঁছে দেয়। (সুনানে আবু দাউদ ৩৬৬০, জামে তিরমিযী ২৬৫৬)

এই হাদীস থেকে জানা গেল বাহক এখানে ইলমের শুধু মূল কথাটি কিংবা সামান্য ব্যাখ্যাসহ মূল কথাটি পৌঁছে দিচ্ছে আর যাকে পৌঁছানো হলো সে মূলের আলোকে গবেষণা করে আরও প্রচুর ইলম বের করে আনছে।

এসব হাদীস দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে মূল ভাষ্য থেকে মাসআলা বের করার প্রতি উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করে।

নবীজি (সা.) কর্তৃক সাহাবায়ে কেরামের ইজতিহাদ সমর্থন :

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ও অনেক বিষয়ে ইজতিহাদ করেছেন। তাদের এ ইজতিহাদকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমর্থনও করেছেন। এ জাতীয় ঘটনার পরিমাণ এত অধিক যে, সবগুলো জড়ো

করলে তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে ইজতিহাদ ও কিয়াসকে শরয়ী দলীল স্বীকার না করে গত্যন্তর থাকে না। যেমন :

(ক) খন্দক যুদ্ধের শেষ দিন একদল সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযা পৌঁছা ব্যতীত আসরের নামায না পড়ে। পথিমধ্যে আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার উপক্রম হলো। এক দল সাহাবী নবীজির বাহ্যিক নির্দেশের ওপর আমল করত: সূর্যাস্তের পর বনু কুরাইযা গিয়ে আসর পড়লেন। আরেক দল সাহাবী নবীজির নির্দেশ থেকে অভীষ্ট লক্ষ্যে যথা দ্রুত পৌঁছার বিধান বের করে সেমতে পথিমধ্যে সময়মতো আসর পড়ে নিলেন। অতঃপর এ ব্যাপারে অবগত হয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই দলের কাউকেও তিরস্কার করেননি। (বুখারী শরীফ ৪১১৯)

(খ) নামাযের জন্য লোকজন কিভাবে জমায়েত করা যায় এ মর্মে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেউ বললেন, নামাযের সময় পতাকা ওড়ানো হোক। লোকেরা পতাকা দেখে একে অপরকে জানিয়ে দিবে। মতটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মনোপুত হলো না। কেউ বললেন, শিঙ্গা বাজানো হোক। নবীজি ইরশাদ করলেন, এটা তো ইয়াহুদীদের কাজ। কেউ পরামর্শ দিলেন, ঘণ্টাধ্বনি দেওয়া হোক। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এটা তো নাসারারা করে থাকে। (সুনানে আবু দাউদ ৪৯৮)

এখানেও সাহাবায়ে কেরাম নিজস্ব কিয়াস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম পরামর্শ পেশ করেছেন। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেগুলো খণ্ডন করেছেন বটে কিন্তু কাউকে ভর্ৎসনা করেননি।

(গ) আরবগণ ইস্তিঞ্জার সময় সাধারণত ঢিলা ও পানির যে কোনো একটি ব্যবহার করত। কুবার অধিবাসীরা ইজতিহাদ করে ঢিলা ও পানির সমন্বয় ঘটাল। আল্লাহ তাদের প্রশংসায় আয়াত নাযিল করলেন। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পবিত্র হতে পছন্দ করে। আর আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা-১০৮)

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুবার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা এমন কী আমল শুরু করেছো, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বললেন, আমরা (ঢিলার সঙ্গে) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করি। (জামে তিরমিযী ৩১০০)

দেখা যাচ্ছে, কুবার অধিবাসীরা নবীজিকে না জানিয়ে নিজেরা ইজতিহাদ করে ইস্তিঞ্জার নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। ইজতিহাদকে বৈধ মনে না করলে তারা কখনও এটা করতেন না।

হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবে এ-জাতীয় বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা দৃষ্টে বুঝে আসে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবদ্দশায়ই সাহাবায়ে কেরাম ইজতিহাদ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনই তাদেরকে ইজতিহাদ করতে নিষেধ করেননি বরং সমর্থন করেছেন এবং ইজতিহাদে ভুল হলে তা শুধরে দিয়েছেন।

শরয়ী কিয়াস যেহেতু ইজতিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত তাই উপর্যুক্ত দলিলগুলোই কিয়াসের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া কুরআন সুন্নায় শরয়ী কিয়াসের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে–

☆ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে ঈমানদারগণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় বন্যশিকারকে হত্যা করো না, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক তা হত্যা করবে, তার ওপর বিনিময় ওয়াজীব হবে, যা (মূল্যের দিক দিয়ে) সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। এর (আনুমানিক মূল্যের) মীমাংসা করে দেবে তোমাদের মধ্য হতে দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি...। (সূরা মায়িদা ৯৫)

ইবনে আব্দুল বার (রহ.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটি বস্তুকে তার সমপর্যায়ে অনুরূপ ও সদৃশ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে তার ওপর বিধান আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটাই কিয়াস। (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহী ২/৮৬৯)

☆ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فاعتبروا يا اولى الابصار

"... অতএব হে চক্ষুষ্মানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। (সূরা হাশার-২)

ইমাম আবু বকর জাসসাস (রহ.) বলেন, ইবরাহীম ইবনে উলাইয়া (রহ.) এই আয়াত দ্বারা কিয়াস প্রমাণ করেছেন। এভাবে যে, আয়াতে اعتبار এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ'তেবার হলো অতিক্রম করা, এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুর দিকে যাওয়া। কিয়াসের মধ্যেও এই অর্থ পাওয়া যায়। কারণ কিয়াস অর্থ হলো কুরআন সুন্নায় বর্ণিত মূল বিধানটি শাখার ওপর আরোপ করা। (উসূলুল জাসসাস ২/২১২)

লেখক : শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামিয়া রহমানিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং
শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা-৫

মাওলানা মুফতী এনামুল হক কাসেমী

(আগস্ট সংখ্যার পর)

এমএলএম ব্যবসা সম্পর্কে ফিকহ ও ফতওয়াবিদদের মতামত :

নেটওয়ার্ক মার্কেটিং যেহেতু অর্থনৈতিক, চারিত্রিক এবং শরয়ী সর্বদিক থেকে অগ্রহণযোগ্য এই কারণে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম তা থেকে বেঁচে থাকার প্রতি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীর নাম পেশ করা হলো।

আরবের ওলামায়ে কেরাম :

১. শায়খ মুহাম্মদ সালেহ আল মুঞ্জিদ ২. ড. আব্দুল হাই ইউসুফ। ৩. ড. আহমদ বিন মূসা এবং ৪. আহমদ খালেদ আবু বকর।

পাকিস্তানি ওলামায়ে কেরাম :

১. মুফতী মুহাম্মদ ইসমতুল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানীর সত্যায়নে। ২. মুফতী মুহাম্মদ হেলাল। ৩. মুফতী মুহাম্মদ নাঈম সাহেব।

ভারতের উলামায়ে কেরাম :

১. মুফতী হাবীবুর রহমান, প্রধান মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ। ২. মুফতী মুহাম্মদ যফীরুদ্দীন। ৩. মুফতী মুহাম্মদ কফীল উদ্দীন, নায়েবে মুফতী দারুল উলূম দেওবন্দ।৪. মুফতী মুহাম্মদ হাসান। ৫. মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, দেওবন্দ। ৬. মাওলানা মুহাম্মদ বুরহান উদ্দীন। ৭. মুফতী মুহাম্মদ জহুর, দারুল উলূম নদওয়া। ৮. মুফতী মুহাম্মদ তাহের, সাহারানপুর। ৯. মুফতী সালমান মনসূরপুরী, শাহী মুরাদাবাদ। ১০. মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ, পাটনা। ১১. মুফতী মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন, দারুল উলূম হায়দারাবাদ।

উল্লিখিত মুফতীয়ানে কেরামের ফতওয়াগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের ছিল। দারুলউলূম আজমগড়ে অনুষ্ঠিত ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর ষোলতম সেমিনারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম এবং মুফতীয়ানে এজামের একটি বিরাট জামা'আতের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে এমএলএম ব্যবসায়িক পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিম্নে কয়েকটি ফতওয়ার হুবহু অনুবাদ পেশ করা হলো।

দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া :

"হাওয়ালা ৬৮১" এই কারবার শিরকতে মুদারাবাহ বা শিরকতে ইনান কোনোটির পদ্ধতিতে পরিচালিত নয়। বরং এটি নিরেট জুয়া এবং সাটটার ওপর নির্ভরশীল।

৪৪০০ ব্যক্তিকে একত্রিত করে, (এটি এমএলএম পদ্ধিতিতে পরিচালিত কোনো বিশেষ কোম্পানির ব্যাপারে বলা হয়েছে) যদি তারা কোম্পানির নিয়মানুযায়ী সদস্য সংগ্রহে সফল হয়ে যায় তাহলে তারা ঘরে বসে বসে মোটা অঙ্কের টাকা পেতে থাকে। পক্ষান্তরে অকৃতকার্য হলে নিজের টাকাও হারিয়ে ফেলে। আর যে কাজ লাভ লোকসানের মাঝে ঘূর্ণায়মান এবং অস্পষ্ট হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ক্বিমার এবং জুয়া বলা হয়। যা অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে হারাম।

এ ছাড়া এই কারবারে শরীয়ত নিষিদ্ধ কয়েকটি বিষয় রয়েছে, যেমন (ক) এক চুক্তির মধ্যে দুই চুক্তি صفقتان فى صفقة (খ) এবং বায় ও শর্ত এক সাথে পাওয়া যায়। যা نهى النبى ﷺ عن بيع وشرط নবী (সা.) বাই ও শর্ত একসাথে করতে নিষেধ করেছেন।" এর পরিপন্থী। এরূপ আরো বহু মন্দ দিক রয়েছে। সে কারণে মুসলমানদের এ ধরনের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া নাজায়েয। (মুফতী হাবীবুর রহমান, সত্যায়নে মুফতী কফীলুর রহমান এবং মুহাম্মদ যফীর উদ্দীন)

সাহারানপুরের ফতওয়া :

(হাওয়ালা ৪৪২) এম ওয়াই (এম এলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি ব্যবসায়ী কোম্পানির নাম) কোম্পানির কাগজপত্র আমরা দেখেছি। ব্যবসায়িক এ পদ্ধতিতে শরয়ী আকদের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন একটি শর্ত এই যে, এই কোম্পানির মেম্বার কোম্পানির পণ্য মার্কেটে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দোকান দিয়ে বিক্রি করতে পারবে না ইত্যাদি। অথচ আকদের সাথে অসামঞ্জস্য কোনো শর্ত আরোপ করার কারণে বেচা-কেনার চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। সাথে সাথে এর মধ্যে জুয়ারও সাদৃশ্যতা রয়েছে। এই জন্য এই কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না। এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই কোম্পানির মেম্বার হওয়া জায়েয হবে না। (মুফতী মুহাম্মদ তাহের, সত্যায়নে মাকসূদ আহমদ)

নদওয়াতুল উলামার ফতওয়া:

(২৩১৩৬-১৭৪৫৪) শরয়ী দৃষ্টিতে এম ওয়াই, কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না। মুসলমানদের জন্য এর মধ্যে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত

থাকতে হবে। (মুহাম্মদ জহুর নদভী)

নোট :

উপরোল্লিখিত ফতওয়াসমূহে এম ওয়াই কোম্পানির স্পষ্ট নাম উল্লেখ করার কারণে কারো এই ধারণা যেন না হয় যে, ফতওয়া শুধু একটি বিশেষ কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বরং এই হুকুম নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে পরিচালিত সব ধরনের কোম্পানির জন্যই প্রযোজ্য। যেহেতু প্রশ্নপত্রে এম ওয়াই এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাই ফতওয়ার মধ্যেও ওই নামটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এমারাতে শরীয়া পাটনার ফতওয়া :

হযরত আবুল মাহাসেন সাজ্জাদ সাহেব একটি ইস্তিফতার উত্তরে লেখেন যে, হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (مسلم، ابو داود ٦٧٣٣)

"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনিশ্চিত বেচা-কেনা থেকে নিষেধ করেছেন।" এবং

لاضرر ولا ضرار فى الاسلام (الاشباه والنظائر ١/٢٧٣)

"ইসলাম কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতিসাধন করা কোনোটিই সমর্থন করে না।"

উপর্যুক্ত হাদীস ও হুকুমের আলোকে ক্রয়-বিক্রয়ের এই পদ্ধতি (এমএলএম) শরীয়তসম্মত নয় এবং নিশ্চিতভাবে বাতিল। যদি ডাউন লাইনের কোনো সদস্য কোনো গ্রাহক সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে তার কোনো কমিশন মিলেনা এবং তার মূল ফিও ফেরত পায় না। অতএব তা এক ধরনের ধোকার শামিল।

কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

প্রশ্ন ১. অনেকে বলেন যে, সদস্য বানানোর উপর কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রদত্ত কমিশন গিফট/পুরস্কারের অন্তর্ভুক্ত। সরাসরি সদস্য সংগ্রহের উপর তো কমিশন দেয়া হয়। নিচের সারিতে সদস্যদের বানানো মেম্বাররা যেহেতু প্রথম সারির মেম্বারদের মাধ্যমেই হয়েছে এই জন্য কোম্পানি যদি পরেও গিফট/পুরস্কারের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে তাহলে এর মধ্যে অসুবিধা কী?

জবাব :

নিচের সারি থেকে নিয়ে উপরের সারির সকল গ্রাহককে শতকরা হারে কমিশন প্রদান সম্পদ জমা করা এবং মাল হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল মাত্র। জুয়ার সাথে এর মিল হতে পারে, গিফট/পুরস্কারের সাথে ন্যূনতম সম্পর্ক নেই। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল চুক্তিতে পুরস্কারের শর্ত যুক্ত হতে পারে না।

প্রশ্ন ২. যেরূপ একটি ভালো কাজের সওয়াবের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে; যেমন, কেউ কাউকে নেক কাজের পথ প্রদর্শন করল, ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমল করার সাথে সাথে তৃতীয় ব্যক্তিকে পথনির্দেশ করল। তাহলে এটি স্পষ্ট যে, পরবর্তী ব্যক্তির আমলের সওয়াব প্রথম ব্যক্তি পেতে থাকবে। ঠিক তদ্রুপভাবে নেটওয়ার্কিং পদ্ধতিতে পরিচালিত কোম্পানিগুলো কমিশনের ধারাবাহিকতা গ্রাহকদের মাঝে জারি রাখে। অতএব এর মধ্যে অসুবিধা কিসের?

জবাব :

সওয়াব প্রদান করা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র। যা সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর মেহেরবাণী কোনো আইন-কানুনের মুখাপেক্ষী নয়। কোম্পানি প্রদত্ত কমিশন এবং আখিরাতের সাওয়াবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিধানকারী থাকা সত্ত্বেও একটিকে আরেকটির সাথে তুলনা করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুর্খতা বৈ কিছু নয়। কারণ, তা দুনিয়ার ব্যাপার, যা বান্দার দ্বারা পূর্ণতা পায়। বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা আইনের অনুগত বানিয়েছেন। এই জন্যই শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ কোনো আইনের অনুগত নন। আখিরাতে ইনসাফের সাথে দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। বান্দার কর্মকাণ্ড আল্লাহর আইন থেকে চুল পরিমাণ ও অতিক্রম করতে পারবে না। সওয়াবের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উদাহরণ :

আমাদেরকে আমাদের শিক্ষকগণ পড়িয়েছেন, আমরা ছাত্রদেরকে পড়াচ্ছি। তাঁরা আবার অন্য ছাত্রদেরকে পড়াবেন। এ ক্ষেত্রে উপরের সারির শিক্ষকগণ নিচের সারির সব ছাত্রদের নেক কাজে সওয়াব পাবেন ঠিকই কিন্তু নিচের সারির ছাত্রদের বেতন-ভাতার কোনো অংশ উপরের সারির শিক্ষকগণ পান না। এমনটি কেন?

প্রশ্ন ৩. মেম্বার বানানোর বিনিময়/মজুরি দালালির মত। যেমন দালাল পণ্য বিকিকিনি করে দেয়ার মজুরি পেয়ে থাকে তদ্রুপ এখানেও নতুন সদস্য বানানোর উপর মজুরি পাবে। এর মধ্যে কি অসুবিধা ?

জবাব :

উল্লিখিত ব্যবসায়িক পদ্ধতি এবং দালালির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

কারণ :

(ক) দালালের মজুরি পণ্য বিক্রির উপর মিলে থাকে। অথচ এখানে এজেন্ট হওয়ার জন্য এজেন্ট নিজেই মজুরি/বিনিময় আদায় করে থাকে। বোঝা গেল, এখানে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত। উল্লিখিত ব্যবসায় পণ্য বিক্রি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং নতুন নতুন এজেন্ট সংগ্রহ করাই অতি গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) দালালের কোনো লোকসান হয় না। সে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করতে থাকে এবং মজুরি/বিনিময় পেতে থাকে।

কিন্তু এখানে শেষ স্তরের প্রত্যেক এজেন্ট নিশ্চিতভাবে লোকসানে থাকে। বাস্তব সত্য কথা হলো, কোম্পানি কোনো না কোনো দিন বিলুপ্ত হবে। (যা না হয়ে পারবে না) শেষ স্তরের এজেন্ট তখন কিছুই পাবে না। তাদের উপর আরেকটি জুলুম হলো, সদস্যপদ অর্জনে আদায়কৃত ফি ও খোয়া যাবে। একটি হলো না তবে দুটি হলো। (আমও গেল ছালাও গেল)। সুতরাং এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংগ্রহ করার কর্মসূচিকে দালালি হিসেবে বর্ণনা করা ভুল।

সার কথা :

নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সম্পদের পাহাড় গড়ার এক অভিনব কৌশল। এর মধ্যে উৎপাদিত সামগ্রী বাহানা হিসেবেই বিক্রি করা হয়। মূল উদ্দেশ্য সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে মুনাফা কামানো। এতে সুদি পন্থার চেয়েও বেশি সম্পদ জমা করার পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া জুয়া এবং লটারির সাথে রয়েছে সাদৃশ্যতা। এর মধ্যে ধোকা ও প্রতারণার দিকটি এত বেশি যে, সম্পদশালী হওয়ার লোভে পুরো জাতিকে অর্থনৈতিক মন্দার কবলে নিক্ষেপ করতে পারে। গুটি কয়েক ব্যক্তিকে লাভবান করার জন্য একটি বিরাট সংখ্যক জনসাধারণকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখে। শেষের দিকের সদস্যরা সব সময় ধোকা এবং লোকসানের মধ্যে থাকে। বরং কখনো কখনো নিচের কয়েক স্তর কমিশন ছাড়া প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। এ কারণেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় পারদর্শী বিজ্ঞজনেরাও ব্যবসায়িক এই পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিভিন্ন দেশে এই কোম্পানিগুলোর উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সাথে সাথে জনসাধারণকেও এতে ফেঁসে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যবসায়িক এ পদ্ধতি চারিত্রিক এবং অর্থনৈতিক কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শরয়ী এবং ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকেও রয়েছে নাজায়েয হওয়ার একাধিক কারণ। যেমন–

☆ সুদ ও জুয়ার সাদৃশ্যতা।

☆ শর্তযুক্ত বেচা-কেনার অস্তিত্ব।

☆ এক চুক্তির মধ্যে দুই ধরনের চুক্তিকে একত্র করা।

☆ ক্রয়-বিক্রয়ের বাহানা দিয়ে অন্য জিনিস অর্থাৎ কমিশনের ইচ্ছা পোষণ করা।

☆ অসার বাতিল পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা।

☆ রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুপস্থিতি।

☆ এবং অনেক ক্ষেত্রে অশেষ ধোকা এবং অত্যধিক বেশি মূল্য নেওয়ার মতো মন্দ দিক রয়েছে।

যে ব্যক্তিকে সরাসরি মেম্বার বানানো হয়, তার ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর প্রাপ্ত কমিশন যদিও জায়েয হওয়ার কথা, কিন্তু তাও যেহেতু পৃথক করে দেওয়া হয় না, বরং তা পাওয়ার জন্য কয়েকজন সদস্য এবং কয়েকটি স্তর অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক এবং সবার কমিশন একত্রে দেওয়া হয়, কাজেই হারাম-হালালের সংমিশ্রণের কারণে প্রথম সারির সদস্যদের বিনিময়ে প্রাপ্ত কমিশন ও হারাম হবে। শুধুমাত্র উৎপাদিত সামগ্রী খরিদ করার জন্য এ-জাতীয় কোম্পানির সদস্য হওয়া শর্তসাপেক্ষে বিক্রয় হওয়ার কারণে নাজায়েয। সদস্য হওয়া ছাড়া পণ্য খরিদ করা জায়েয বটে। কিন্তু এ-জাতীয় কোম্পানির সহযোগিতা হওয়ার কারণে মাকরূহ হবে। এ ধরনের কোম্পানি অর্থনৈতিক বিবেচনায় উপকারী নয়, সামাজিক দিক থেকেও অংশগ্রহণের অনুপযোগী। আবার ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতেও নাজায়েয। এসব কারণে উক্ত কোম্পানিগুলোর সদস্য হওয়া এবং কমিশন গ্রহণ করা নাজায়েয ও হারাম। উপরোল্লিখিত কারণগুলোর কারণে এই কোম্পানিগুলোতে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয। ভারত উপমহাদেশ ও আরবের প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম এবং মুফতীগণ ইহা নাজায়েয হওয়ার ফতওয়া প্রকাশ করেছেন। দিল্লির ইসলামিক ফিকহ একাডেমীর ষোলতম সেমিনারে ওলামায়ে কেরামের একটি বিরাট জমা'আত এই ব্যবসা হারাম হওয়ার ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

এমএলএম সম্পর্কে সর্বপ্রথম ফিকহী সেমিনার :

২০০০সালের দিকে যখন বাংলাদেশের ঢাকা শহরে এমএলএম পদ্ধতির সবেমাত্র নাম শোনা যাচ্ছিল। এ পদ্ধতিতে দু-একটি বিদেশি কোম্পানি যেমন জিজিয়ান ও টংচেং তাদের ব্যবসা শুরু করেছিল। অতি অল্প সময়ে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণের গণ্ডি থেকে বের হয়ে তা মসজিদের ইমাম-মুআযযিন, মাদরাসার শিক্ষক ও ওলামায়ে কেরামদেরকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। পদ্ধতিটি যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন, তাই তার শরয়ী বিশ্লেষণের দিকটি গুরুত্ববহ হয়ে দাঁড়াল। ব্যবসাটিকে কেউ কেউ জায়েয বললেও অনেকে নাজায়েয ও অবৈধ বলে আসছিলেন। বিষয়টি যেহেতু ওলামায়েকেরামের জন্য নতুন তাই শরয়ী সমাধানের কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ড বাংলাদেশ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ফকীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) খুব তাড়াহুড়া করে ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা

ঢাকায় বোর্ডের সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরামদের নিয়ে ২৩ মে ২০০০ ইং ১৮ সফর ১৪২১হিঃ মঙ্গলবার একটি ফেকহী সেমিনারের আয়োজন করেন। এতে মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব- মুফতী দারুল উলূম হাটহাজারী, মুফতী শাহাদাত হোসাইন সাহেব- মুফতী জামিয়া আরবিয়া জিরি, চট্টগ্রাম, মুফতী হাবীবুর রহমান সাহেব- ফুলগাজী মাদরাসা ফেনী, মুফতী মনসুরুল হক সাহেব- জামিয়া রহমানিয়া ঢাকা, মুফতী তাজুল ইসলাম সাহেব- জামিয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ মিরপুর, মুফতী আবু সাঈদ সাহেব- জামিয়া এমদাদিয়া ফরিদাবাদ, মুফতী নূরুদ্দিন সাহেব (রহ.)- সাবেক ভারপ্রাপ্ত খতীব জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম ঢাকা, মুফতী মুহিউদ্দীন সাহেব- জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, মুফতী মকবুল হোসাইন সাহেব- জামিয়া সুবহানিয়া উত্তরা, মুফতী আতাউর রহমান সাহেব- মঈনুল ইসলাম মাদরাসা ঢাকা এবং কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার সম্মানিত মুফতিয়ানে কেরাম উপস্থিত ছিলেন।

এই সেমিনারে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা নেটওয়ার্ক ব্যবসার ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। সেমিনারে উপস্থিত মুফতিয়ানে কেরামের সিদ্ধান্ত ও কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকার মুফতিয়ানে কেরামের গবেষণামূলক মাল্টি লেভেল ব্যবসা-সংক্রান্ত একটি ফতওয়া প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ফতওয়াটির রেফারেন্স এবং উক্ত ব্যবসার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ দীর্ঘ একটি মাকালা তথা প্রবন্ধ লেখা হয়। সম্ভবত মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সম্পর্কে এই ফতওয়া ও প্রবন্ধই উপমহাদেশে সর্বপ্রথম। এটির ভিত্তিতে ক্রমান্বয়ে আরো বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম মাল্টি লেভেল মার্কেটিং নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। পরে অবশ্য এই ব্যবসাটি নতুন নতুন নামে আরো বহু পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে ব্যবসা আরম্ভ হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে নাম ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও মৌলিক দিকগুলো সবই এক ও অভিন্ন। সর্ব ক্ষেত্রে প্রতারণা ও ধোকা এবং শরীয়ত কর্তৃক অবৈধ নিয়মপদ্ধতি চালু আছে। এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এর যে ভিত্তি রয়েছে তা অটুট রেখে কোনোভাবে এই ব্যবসাকে শরীয়ত সম্মত করার মত কোনো সম্ভাবনা নেই।

এতদ কারণে বর্তমানে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞ আলেমগণ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ তথা সর্ব দিক থেকে অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

(সমাপ্ত)

লেখা আহ্বান লেখা আহ্বান লেখা আহ্বান

আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহ্বান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলামপ্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মেটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তথ্যবহুল হতে হবে।
৪। কোনো সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রতিটি বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ-৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাঁট করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি ইংরেজি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতর : মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

কোয়ান্টাম মেথড-৫

পবিত্র হাদীস বিকৃতির অভিনব কৌশল

মুফতী শরীফুল আ'জম

পবিত্র কুরআন যেমন ঐশীবাণী পবিত্র হাদীসও তেমনি ঐশী বাণীর একটি প্রকার। তফাত শুধু এটুকু যে, কুরআনের শব্দ ও মর্ম উভয়টি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ আর হাদীসের মর্ম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আর শব্দসমূহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র জবান থেকে নিঃসৃত। তাই কুরআনের মাঝে বিকৃতি সাধন যেমন জঘণ্য, হাদীসের বেলায়ও বিকৃতি বা বানোয়াটের আশ্রয় নেয়া হলে তার পরিণতি খুব ভয়াবহ। এ ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (مشكوة ٢٣) "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে সে যেন নিজের অবস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" (মেশকাত ২৩)

সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বদা এই ভীতিই কাজ করত। ফলে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা যারপরনাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পাঁচ শত হাদীসের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁকে সারা রাত বিছানায় ছটফট করতে দেখলেন। সকাল বেলা তিনি বললেন যে, হাদীসের যে পাণ্ডুলিপিটি তোমার কাছে রেখেছিলাম তা নিয়ে আসো। পিতার কথা মতো পাণ্ডুলিপি সামনে উপস্থিত করলে তিনি সেটিকে পুড়িয়ে ফেললেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হাদীসগুলো পুড়িয়ে ফেলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার ভয় হয় যে, আমার মৃত্যুর পর এ পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে রয়ে যাবে। যাতে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে শোনা বর্ণনা ও স্থান পেয়েছে। যেগুলোকে আমি নির্ভরযোগ্য মনে করেছিলাম, অথচ বাস্তবে হয়ত তা গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে সেখানে কোনো ধরনের গড়বড় রয়েছে। যার দায়দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। কাজেই এই গোনাহের ভাগিদার হওয়ার ভয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললাম। .....

হযরত আলী (রা.) বলেন, اذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثا فوالله لان اخر من السماء احب الى من ان اكذب عليه "আল্লাহর কসম আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সূত্রে কোনো হাদীস তোমাদের কাছে বর্ণনা করি তখন তার ওপর মিথ্যারোপ করার চেয়ে আসমান থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ আমার কাছে প্রিয় মনে হয়।" (বুখারী ২/১০২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যিনি নবীজি (সা.)-এর বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন এবং ঐ সকল সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ফতাওয়া প্রদান করতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সতর্কতা ছিল উল্লেখযোগ্য। হযরত আমর ইবনে মাইমুন (রা.) বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার রাতে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মজলিসে হাজির হতাম। আমি কখনো তাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি নিসবত করে কথা বলতে শুনিনি। একদা হাদীস বলতে গিয়ে তাঁর যবান থেকে "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন" এ বাক্য বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। নয়ন অশ্রুশিক্ত হয়ে ওঠে। কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যায় এবং রগগুলো ফুলে যায় আর সাথে সাথে তিনি বলে ওঠেন ইনশাআল্লাহ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনই ইরশাদ করেছেন, বা এর কাছাকাছি বা কিছু কম বেশি হতে পারে। (মুসনাদে আহমদ) এই হলো হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের সতর্কতার নমুনা।

হাদীসের প্রতিটি শব্দ কী ধরনের সতর্কতার সাথে হেফাজত করা হয়েছে তার প্রমাণ হাদীস গ্রন্থের পাতায় পাতায় বিদ্যমান। বিশুদ্ধ রূপে হাদীস ভাণ্ডারকে সংরক্ষণ করার জন্য উম্মতের বিশাল এক কাফেলা নিজেদের জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্য শতশত মাইল পথ পাড়ি দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। সব কষ্ট ক্লেশ বরদাশত করেছেন কিন্তু হাদীসের মাঝে একটি শব্দ পরিবর্তনকে মেনে নেননি। বরং সতর্কতা অবলম্বনের বিরল দৃষ্টান্ত কায়েম করে দেখিয়েছেন। এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি হাদীস তুলে ধরা হলো।

عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله ﷺ ان الله لايجمع امتى او قال امة محمد على ضلالة ـــ(مشكوة :٣٠)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে অথবা বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে ভ্রষ্টতার ওপর একমত করবেন না...।" (মিশকাত পৃষ্ঠা ৩০) এখানে বর্ণনাকারীর সতর্কতা লক্ষণীয়। যদিও "আমার উম্মত" আর

"উম্মতে মুহাম্মদিয়া" একই কথা কিন্তু রাসূলের শব্দ কোনটি তা নিশ্চিত না হওয়ায় সতর্কতামূলক উভয়টি উল্লেখ করেছেন।

এটা ইসলামের একটি গৌরব যে, দেড় হাজার বছর পার হওয়া সত্ত্বেও নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীসমূহ হুবহু শব্দে শব্দে সংরক্ষিত হয়ে আছে। যেখানে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু কি তাই? হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবনী পর্যন্ত সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। এবং তাদের সভাব চরিত্র ও গ্রহণযোগ্যতাসহ যাবতীয় তথ্য এমনভাবে সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, এর ওপর বিশাল কিতাব ভাণ্ডার রচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে এমন দৃঢ় ও মজবুত অবস্থান তৈরি হয়ছে যে, শত চেষ্টা করেও কেউ হাদীসের মাঝে কোনো রদবদল, শব্দ পরিবর্তন বা অর্থ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি এবং হবে না। যা বর্তমান যুগে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম হওয়ার একটি অলৌকিক প্রমাণ।

নব্বই ভাগ মুসলমানের এই সোনার বাংলাদেশে সর্বস্তরের মানুষের মাঝেই রয়েছে ইসলামের প্রতি গভীর আকর্ষণ, মহব্বত ও ভালোবাসা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতি রয়েছে তাদের বিপুল ভক্তি-শ্রদ্ধা। কুরআন-হাদীসের ভাষা আরবী ভাষায় লেখা কোনো কাগজ ও কেউ অজু ছাড়া স্পর্শ করতে চায় না। কুরআন-হাদীসের কথা শোনালে যে কারো মন না গলে পারে না। কুরআন-হাদীসের প্রতি মুসলমানদের এই মহববত ও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশে কালের আবর্তনের সাথে সাথে বহু বাতেল ফেরকা সমাজে তাদের অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কুরআন-হাদীসের প্রলেপ লাগিয়ে সব ধরনের তেতো সফলভাবে এ দেশের সরলমনা ইসলামপ্রিয় জনগণকে গলাধঃকরণ করাতে পেরেছে। অতএব, ইতিহাস স্বাক্ষী ইসলামের দুশমনেরা সর্বযুগে কুরআন-হাদীসকে গলায় বেঁধেই মুসলমানদের গোমরাহ করার পথ নিষ্কণ্টক করেছে।

কোয়ান্টামের মেধাবী কর্ণধারগণ এ দেশের মুসলমানদের ধর্মীয় মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চয়ই ওয়াকিফহাল রয়েছেন। মানুষের ব্রেন ও মাইন্ড নিয়ে তাদের গবেষণা একটু বেশিই বলা চলে। তাই এ সুযোগকে তারা হাতছাড়া করবেনই বা কেন? কুরআন কণিকা ও হাদীস কণিকা নামে পুস্তিকা রচনা করে কোয়ান্টাম ধর্মপ্রাণ জনগণকে নতুন একটি মতাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করছে। কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী প্রচারের নামে এর মূল শিক্ষাকে কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে ঘষামাজা করে কিছু আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। ইসলামকে সকল ধর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল রূপে তুলে ধরা হয়েছে। সকল ধর্মই যেন ইসলামে স্বীকৃত এমন একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই চিন্তাধারাটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন শব্দের অর্থ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতে তাদের একটুও হাত কাপেনি। উল্টো বীরত্বের সাথে এগুলো বাধাহীনভাবে প্রচার করে যাচ্ছে তারা। বিশেষ করে شهـادت শাহাদাত, عـلـم ইলম, مسلم মুসলিম, مومن মুমিন, دين দ্বীন, احسان ইহসান ইত্যাদি শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আবার কোনো কোনো হাদীসকে আংশিকভাবে উল্লেখ করেছে। কখনো এমন ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হাদীস এনেছে, যার ব্যাখ্যা ছাড়া মর্ম অনুধাবন অসম্ভব। যুগ যুগ ধরে বিশুদ্ধ রূপে সংরক্ষিত হাদীস ভাণ্ডার যেন তাদের কাছে ছেলেখেলা। হাদীস বিকৃতির ব্যাপারে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধমক তাদের অন্তরে সামান্য রেখাপাত করেছে বলেও মনে হয় না। আসুন এবার দেখা যাক কী তেতো মেশানো হয়েছে কোয়ান্টাম কণিকায়। এ পর্যায়ে হাদীস কণিকা অধ্যায় থেকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হবে। প্রথমে ওই সকল হাদীসের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা উল্লেখ করে কোয়ান্টামের বিকৃত মর্মবাণী তুলে ধরা হবে।

এক.

عـن ابـن عـمرؓ قال قال رسول الله ﷺ بـنـى الاسـلام على خمس شهادة ان لا الـه الا الـلـه وان محمداعبده ورسوله واقـام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان (متفق عليه)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল..."

উক্ত হাদীসের মাঝে ইসলামের পঞ্চভিত্তির প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান। আর কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি মুখের সাথে সম্পর্ক রাখে অন্তরের সাথে নয়। মুসলমান হতে হলে এ ব্যাপারে অন্তরের বিশ্বাসের পাশাপাশি মুখেও স্বীকার করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। যদি অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস থাকে আর মুখে এর সাক্ষ্য প্রদান করা না হয় তবে

সে দুনিয়াতে মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। বরং এ ধরনের বাহ্যিক সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। এক হাদীসে এসেছে–

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল" মানুষেরা এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অতএব মুসলমান হতে হলে এ কথার মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান আবশ্যক। শুধু অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

এবার দেখা যাক কোয়ান্টামের ছলচাতুরীর কয়েকটি নমুনা।

এক. কোয়ান্টাম কণিকায় উক্ত হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। "ইসলামের মূল ভিত্তি ৫টি। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রাসূল বলে বিশ্বাস করা....।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৫)

এখানে হাদীসের শব্দ شهادة এর অর্থ সাক্ষ্য প্রদান এর স্থলে 'বিশ্বাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীস বিকৃতির এটি একটি জঘণ্যতম দৃষ্টান্ত। বিষয়টি ইসলামের মূল ভিত্তি-সংক্রান্ত হওয়ায় এর গভীরতার মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান ছাড়াও মুসলমান হতে পারে। ইসলামের ভিত রচিত হতে পারে বিধায় অন্তরের বিশ্বাস ঠিক রেখে সকল ধর্মের লোককে খুশি রাখার জন্য শাহাদাতকে গোপন রেখে সকলের সাথে তাল মেলানোর পথ সুগম হয়ে গেল। অথচ সাক্ষ্য প্রদান আর বিশ্বাস স্থাপন এ দুটি কখনোই সমার্থবোধক হতে পারে না।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর প্রাণপ্রিয় চাচাজান আবু তালিবের নবীজির ওপর আন্তরিক বিশ্বাসের কোনো ঘাটতি ছিল না। কিন্তু শুধু মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানে অপারগ হওয়ায় তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করতে পারেননি। এ সাক্ষ্য আদায়ের জন্য মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। এর মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব সহজে অনুধাবন করা যায়। তাই কোয়ান্টামের মর্মবাণী নামে এই অনুবাদ হাদীসের মর্মার্থ বিকৃতির একটি অপকৌশল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই.

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।"(মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪)

এখানে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ বা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থিব জ্ঞান অর্জন ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবে তা প্রত্যেকের জন্য ফরজ করা হয়নি। দুনিয়াবী শিক্ষা যে যতটুকু লাভ করুক বা না করুক তবে দ্বীনি ইলম অবশ্যই প্রত্যেক মুসলমানকে প্রয়োজন পরিমাণ শিখতে হবে। এই ইলমের মাঝে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাস, নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী সংক্রান্ত ইলম অন্তর্ভুক্ত। কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসকে উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে– "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর জন্য ফরজ।" (কোয়ান্টাম কণিকা-পৃষ্ঠা ৩১৮)

হাদীসে উল্লেখিত (علم) ইলম শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'জ্ঞান'। অথচ ইলম ও জ্ঞানের অর্থের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। (মাসিক আল-আবরারের জুলাই ২০১২ সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে তা দেখা যেতে পারে।)

এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ইলম শিক্ষাকে ফরজ তথা বাধ্যতামূলক করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের অনুবাদ দ্বারা সর্বপ্রকার পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা হাদীসের মাঝে বিকৃতি সাধনের একটি রূপ।

দ্বিতীয়ত : হাদীসে বলা হয়েছে (على كل مسلم) "প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ"। এখানে বিশ্বাসী বা নর-নারী অনুবাদ করার মাঝে কোয়ান্টামের মতলব কী? বিশ্বাস বা বিশ্বাসী শব্দের যে অর্থ কোয়ান্টামের নিজস্ব পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে থাকে তাতে মুমিন -মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। যে কোনো ধর্মের লোকই এই বিশেষ অর্থে বিশ্বাসী বলে পরিচিত হতে পারে। বিশ্বাস বলতে তারা 'মুক্ত বিশ্বাস'কে বোঝায়। "আমি পারি আমি পারব" এ কথাটিই মূলত কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের বক্তব্য বা শিক্ষা। এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা মুসলিম যে কেউ হতে পারে। মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস শিরোনামে ইতিপূর্বে মাসিক আল-আবরারে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। প্রয়োজনে তা দেখা যেতে পারে।

কোয়ান্টামের এই বিকৃত অনুবাদে হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের আর কোনো বৈশিষ্ট্য বাকি থাকেনি। বরং মুসলিম ও অমুসলিমের ভেদাভেদটিই

দূর হয়ে গেছে। আসলে কোয়ান্টামের মূল টার্গেটও তাই। ইসলামকে অন্য ধর্মের সাথে গুলিয়ে ফেলাই মনে হচ্ছে তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ ইসলামকে অন্যসব ধর্মের ওপর বিজিত করতে আল্লাহ তা'আলা শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে প্রেরণ করেছেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের ওপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ- আয়াত ৯)

তাই সকল ধর্মের লোককে খুশি করতেই কোয়ান্টাম হাদীসে বর্ণিত মুসলিম শব্দের অর্থ মুসলমান না করে বিশ্বাসী করেছে কি না তা ভেবে দেখা দরকার।

তিন.

عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ﷺ تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ (متفق عليه)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "কোনো রমণীকে চার কারণে বিবাহ করা হয়ে থাকে। মাল, বংশ, রূপ ও দ্বীন। অতএব দ্বীনের বিষয়টি প্রাধান্য দাও, তুমি সফলকাম হবে।" (বুখারী মুসলিম)

উক্ত হাদীসে দ্বীনদার মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। দ্বীনদারী বলতে ইসলামের সকল হুকুম-আহকাম পালন করাকে বোঝায়। আর নারীদের বেলায় বিশেষ করে শরয়ী পর্দা পালনের বিষয়টি সর্বাগ্রে আলোচনায় আসে। তাই দ্বীনদার রমণী বলতে পর্দানশীন, মুমিন, মুত্তাকি রমণী উদ্দেশ্য।

এবার আসা যাক কোয়ান্টাম কণিকায়। উক্ত হাদীসটিকে সেখানে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– "কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্য বিয়ে করা যায়। ১. সম্পদ ২. বংশমর্যাদা ৩. রূপ ৪. গুণ। এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে। অন্য বিবেচনায় বিয়ে করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩১৮) হাদীসে উল্লেখিত (ديـــن) দ্বীন শব্দের অনুবাদ কৌশলগত কারণে পরিবর্তন করে 'গুণ' বলা হয়েছে। নারীর গুণ বলতে কী বোঝায়? বুদ্ধিমতী, মিষ্টভাষী, মিশুক, সদাচারী ও সংসারী ইত্যাদি বিভিন্ন মানবীয় গুণ, যা প্রত্যেকের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু এ সকল গুণের জন্য মুসলমান হওয়া বা পর্দানশীন হওয়া জরুরি নয়। একজন অমুসলিম রমণীও এ সকল গুণের অধিকারীনী হতে পারেন। কোয়ান্টামের অনুবাদ অনুযায়ী মুসলিম/অমুসলিম নারীকে বিবাহ করার মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই, শুধু গুণবতী হলেই চলবে। অথচ উক্ত হাদীসের মূল শিক্ষাই হলো বিবাহের ক্ষেত্রে মুমিন, মুত্তাকি ও দ্বীনদার রমণীকে প্রাধান্য দেওয়া। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা دين দ্বীন শব্দের অর্থ বিকৃতির মাধ্যমে কোয়ান্টাম ইসলামের একটি মৌলিক বিধানকেই শিথিল করে দিয়েছে। সকল ধর্মকে সমন্বয়ের বিকৃত মানসিকতা চরিতার্থ করতেই তারা এমন অপব্যাখ্যা দিয়ে চলছে। আবার হাদীসের মর্মার্থ পরিবর্তনের নাম দিয়েছে মর্মবাণী, যা চরম হাস্যকরও বটে।

চার.

প্রসিদ্ধ হাদীসে জিব্রাঈলের শেষ অংশে احســان ইহসানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ان تعبد الله كانك تراه، فان لـم تكن تراه فانه يراك "এমনভাবে তুমি আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর তুমি যদি তাঁকে দেখতে নাও পাও তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন.....।" (বুখারী)

এখানে সদাসর্বদা সকল ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করার কথা বলা হয়েছে। (মিরকাত ১/১২০)

অন্তরের মাঝে এমন অবস্থা ও ভাব সৃষ্টি হওয়াই প্রকৃত 'ইহসান'। যা বিশেষ কোনো ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

কোয়ান্টাম কণিকায় এই হাদীসের অনুবাদ পরিবর্তন করে বলা হয়েছে "এমনভাবে নামায পড়ো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো...।" (কোয়ান্টাম কণিকা ৩১৫)

অথচ হাদীসটিতে নামায শব্দের কোনো উল্লেখ নেই। বরং হাদীসটি ব্যাপক, প্রত্যেক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একে নামায, রোযা বা অন্য কোনো বিশেষ ইবাদতের সাথে নির্দিষ্ট করা ভুল।

পাঁচ.

মহিলাদের মসজিদে গমনের বিষয়টি নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে কিছুটা শিথিল ছিল। সে সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন বিধিবিধান জারি হতো, যা মসজিদে বসে তা'লীম দেওয়া হতো। নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই মজলিসে মহিলা সাহাবীগণও আগ্রহের সাথে শরীক থাকতেন। এ হিসেবে মহিলাদের মসজিদে নববীতে হাজির হওয়ার অনুমতি দেওয়া হলেও বারবার তাদেরকে নিজ গৃহে নামায আদায়ের তাকিদ দেওয়া হতো। শুধু তা-ই নয়, নিজ গৃহের নামায মসজিদে নববীতে

হাজির হয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইমামতিতে নামায আদায় অপেক্ষা শ্রেয় ও সওয়াবের কাজ বলেও ঘোষণা করা হতো। অসংখ্য হাদীস যার প্রমাণ বহন করে। উল্লেখ থাকে যে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মদীনা শরীফে একাধিক মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মহিলারা উল্লিখিত বিশেষ কারণে শুধু মসজিদে নববীতে যাওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য কোনো মসজিদে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহকে প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ আবু দাউদ শরীফে দুটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ১. باب ماجاء فى خروج النساء الى المسجد মহিলাদের মসজিদে গমন বৈধ কি না? ২. باب التشديد فى ذلك মহিলাদের মসজিদে গমনে কঠোরতা। (বযলুল মজহুদ ৪/১৬৪) এই দুই অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করলে মনে হয় যেন প্রথমটিতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দ্বিতীয় অধ্যায়টি লেখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, لا تمنعوا اماء الله مساجد الله "আল্লাহর বান্দিগণকে আল্লাহর মসজিদসমূহে আসতে নিষেধ করো না।" সেই একই সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে لاتمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن "তোমাদের মহিলাগণকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" অর্থাৎ তাদের নিজ গৃহে নামায আদায় মসজিদে নামায আদায় অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু তাতে পর্দার পূর্ণতা রয়েছে। উক্ত হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এখানে প্রথম বাক্যে মহিলাদের মসজিদে গমনে বাধা দিতে পুরুষদের নিষেধ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে ঘরে নামায আদায় করতে মহিলাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এটা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর আদর্শ শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি উদাহরণ। যাতে মহিলাদের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদও না হয় আবার মহিলাদের মসজিদে গমনও যেন বন্ধ হয়। দুই পক্ষকে দুই ধরনের নির্দেশ প্রদানের নজির আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। হাদীস ভাণ্ডারে নজর দিলে যার সন্ধান মেলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) মহিলাদের মসজিদ গমনে কঠোরতা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, "যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের এ সকল কর্মকাণ্ড দেখতেন তাহলে অবশ্যই তাদের মসজিদে গমণ করতে নিষেধ করতেন। যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।" এর পরের হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মহিলাদের জন্য বারান্দায় নামায আদায় করার চেয়ে ঘরের ভেতর নামায আদায় করা উত্তম। আর ঘরের চেয়ে অন্দরমহলের ছোট্ট কুঠুরিতে নামায আদায় করা উত্তম। (আবু দাউদ)

উভয় ধরনের হাদীস দ্বারা যে শিক্ষা উম্মতকে দেওয়া হয়েছে তার সারকথা আবু দাউদ শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ বজলুল মজহুদে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلوات كلها لظهور الفساد "ফেতনা-ফাসাদের সয়লাবের কারণে সকল নামাযে মহিলাদের মসজিদে গমন মাকরূহ তথা নিষেধ।" (বজলুল মজহুদ ৪/১৬৫)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক এভাবে দুই ধরনের অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন করে মহিলাদের মসজিদে গমন-সংক্রান্ত হাদীস উল্লেখ করার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে কোয়ান্টাম কণিকায় শুধুমাত্র আবু দাউদ শরীফের প্রথম অধ্যায়ের ইবনে উমর (রা.)-এর প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে। "তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিও না।" (কোয়ান্টাম কণিকা পৃষ্ঠা ৩২০)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটিকে বর্জন করা হয়েছে, যাতে উল্লেখ আছে যে, وبيوتهن خير لهن "তবে তাদের ঘর তাদের জন্য শ্রেয়।" আর আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় অধ্যায়ের হাদীসের প্রতিতো ভ্রুক্ষেপই করা হয়নি। যার ভিত্তিতে মহিলাদের মসজিদে গমন নিষেধ করা হয়। এভাবে একটি বিষয়ের শুধু অংশ বিশেষ উল্লেখ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর মহিলাদের ঘর থেকে বের করার পথ মসৃণ করা হয়েছে। কোয়ান্টাম এভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের করে তাদের বিভিন্ন কোর্সে নিয়ে যাচ্ছে, মঞ্চে উপস্থিত করছে এবং দূর-দুরান্তের মহিলাদেরকে বান্দরবানের লামায় জমায়েত করে চলেছে।

হাদীসের এমন অপব্যাখ্যা করে, শরীয়তের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর পরিভাষা পরিবর্তন করে, ইসলামকে এক নতুন লেবাসে উপস্থাপন করার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। হাশরের ময়দানে দ্বীনের মাঝে এমন বিকৃতিকারীদেরকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুহকান, সুহকান তথা দূর হও, দূর হও বলে তাড়িয়ে দেবেন। আর তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। অতএব এই পথে হেঁটে সফলতার চাবিকাঠি আদৌ কোয়ান্টিয়ার ভাইদের হস্তগত হবে কি না ভেবে দেখা উচিত।

মাতা-পিতা ও সন্তানের পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম ও স্থায়ী সম্পর্ক যেসব ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে, তন্মধ্যে মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক অন্যতম। এ সম্পর্ক জন্মগত, যা অস্তিত্বের মাঝে বিরাজমান। মানুষ যতদিন তার অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে, তত দিন সে তার মাঝে স্বীয় মাতা-পিতার নমুনা বহন করবে। সন্তান পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার বহু আগ থেকেই মাতা-পিতার দেহে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে মাতা-পিতা অবস্থান করে তার মাতা-পিতার দেহে। এভাবে মানব প্রজন্মের একটি ধারা গিয়ে মিশে যায় পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মাঝে। তাই কোনো সন্তান যদি তার মাতা-পিতার খেদমত করে, সঠিক মর্যাদা বজায় রাখে, তাহলে বলা যায়, সে যেন গোটা মানব প্রজন্মের খেদমত করল, গোটা মানব জাতিকেই সে সম্মান দেখাল। আর যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খেদমত করে না, সঠিক মর্যাদা বজায় রাখে না, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই অবজ্ঞা করল, অসম্মান করল।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।' {সূরা আহকাফ, আয়াত-১৫} উক্ত আয়াতে মায়ের কষ্টের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পেছনে পিতার চেয়ে মাতার কষ্ট অনেক অনেক গুণ বেশি।

সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতা-পিতার প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু হক্ব কার্যকর হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই সেই হক অনুযায়ী আমল করা মাতা-পিতার কর্তব্য হয়ে যায়। মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের হক হচ্ছে প্রথমত: তিনটি। (১) জন্মের পর পরই তার একটি সুন্দর ধর্মীয় নাম রাখতে হবে। (২) জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়লে তাকে কুরআন তথা ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। (৩) আর সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হবে, তখন তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত সন্তানের ভালো একটি নাম না রাখা, কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা না দেয়া এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা, মাতা-পিতার অপরাধের মধ্যে গণ্য। এসব কাজ না করলে মাতা-পিতার পারিবারিক দায়িত্ব পালিত হতে পারে না। ভবিষ্যত সমাজও ইসলামী আদর্শ মোতাবেক গড়ে উঠতে পারে না।

☆ অনুরূপভাবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিনে আকীকা করাও মাতা-পিতার দায়িত্ব। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সপ্তম দিনে সন্তানের নাম রাখতে, মস্তক মুণ্ডন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ দিয়েছেন। {তিরমিযী শরীফ, হাদীস-২৭৫৮} আজকাল অনেক মুসলমানের সন্তানের নাম শুনে বোঝার উপায় নেই যে, সে মুসলিম কি না! একজন মুসলমানের নাম শুনেই বোঝা যাবে যে, সে একজন মুসলমান। পোশাক-আশাকেও বোঝা যেতে হবে যে, সে একজন মুসলমান। চাল-চলনে, ওঠা-বসায়, কথাবার্তায় তথা সকল ক্ষেত্রেই একজন মুসলমান অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে হবে সুন্নাতে নববীর মূর্তপ্রতীক। মাতা-পিতা যদি সন্তানের হক্ব সঠিকভাবে আদায় করে, তার সুন্দর একটি নাম নির্বাচন করে, ইসলাম শিক্ষা দেয়, সঠিক সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে, তাহলে ওই সন্তান কখনো মাতা-পিতার কষ্টের কারণ হতে পারে না। বরং সে হবে মাতা-পিতার চোখের শিথলতা। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন, যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে দিন।' {সূরা ২৫ ফুরকান, আয়াত-৭৪}

☆ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলাও মাতা-পিতার দায়িত্ব। হযরত আবু রাফে (রা.) বলেন, 'হযরত ফাতেমা (রা.) যখন হুসাইনকে প্রসব করলেন, তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর কানে নামাযের আযান শোনাতে আমি দেখেছি। {আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪৪৪১}

এখানে একটি বিষয়ের প্রতি ওলামায়ে কেরাম ইঙ্গিত দিয়েছেন। তা হলো, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় আযান-ইকামত দেয়া হলো। এখন নামায পড়ার পালা। অর্থাৎ মানুষের ভূমিষ্ট হওয়াটাই যেন নামাযের উদ্দেশ্যে। তাই তো হাদীস শরীফে সাত বছর বয়স থেকেই নামাযের আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের নামায পড়তে আদেশ করো, যখন তারা সাত বছর বয়সে পৌঁছবে এবং নামাযের জন্য তাদের প্রহার করো (শাসন করো) যখন তারা দশ বছরে উপনিত হবে। আর তখন তাদের জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করাও কর্তব্য।'{আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪১৮}

ভূমিষ্ট হওয়ার পর পরই নবজাতকের কানে আযান ও ইকামত দেয়ার বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম আরেকটি ইঙ্গিত পেশ করেছেন। তা হলো, জানাযার নামাযের কোনো আযান-ইকামত নেই। অর্থাৎ ভূমিষ্ট হওয়ার পরপর যে আযান-ইকামত দেয়া হলো, তা যেন জানাযার নামাযেরই আযান ও ইকামত। আযান-ইকামত ও নামাযের মাঝে যেমন সময় খুব বেশি থাকে না, অনুরূপভাবে

ভূমিষ্ট হওয়া আর মৃত্যুবরণ করার মাঝেও খুব একটা সময় থাকে না। তাই মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি জন্মের পর থেকেই গ্রহণ করা উচিত।

মাতা-পিতা হিসেবে সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বড় যে দায়িত্ব, তা হলো তাওহীদ বা একত্ববাদের আদর্শে সন্তানের জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলা। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হযরত লোকমান (আ.)-এর নসিহত তাঁর পুত্রের প্রতি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। কেননা, শিরক হচ্ছে অত্যন্ত বড় জুলুম।' {সূরা ৩১ লোকমান, আয়াত-১৩}

মাতা-পিতার উপর সন্তানের জন্য যেমন কিছু করণীয় দায়িত্ব রয়েছে, অনুরূপভাবে সন্তানের উপরও মাতা-পিতার জন্য অবশ্য করণীয় কিছু দায়িত্ব আছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়জন তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে উফ (বিরক্তি, উপেক্ষা, ক্রোধ অথবা ঘৃণাসূচক কোনো কথা) বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনত করবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি রহমত নাযিল করো, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছে।' {সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-২৩-২৪}

উল্লিখিত আয়াতে প্রথমে আল্লাহকে সর্বোতভাবে এক ও লা-শারীক বলে স্বীকার করার নির্দেশ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামান্যতম বন্দেগী করতেও স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাতা-পিতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার। এ দুটি নির্দেশ একসঙ্গে দেয়ার অর্থ এই যে, প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও মাতা-পিতার বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী তো মহান আল্লাহ। সুতরাং বান্দার ওপর সর্বপ্রথম হক্ব তাঁরই ধার্য হবে। কিন্তু আল্লাহ যেহেতু এ কাজ সরাসরি নিজে করেন না, বরং মাতা-পিতার মাধ্যমে করিয়ে নেন, তাই বান্দার ওপর আল্লাহর হক্বের পর পরই মাতা-পিতার হক্ব ধার্য হবে। মাতা-পিতা কর্তৃক শৈশবে সন্তানের প্রতি যে দরদ-মায়া ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়, সেই আচরণের কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ মাতা-পিতার প্রতি রহমত কামনা করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। মাতা-পিতার জন্য মহান আল্লাহ সরাসরি দু'আ করার নির্দেশ দিয়ে তাদের সম্মান যে কত উঁচু সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। সেই সাথে সন্তানের উচিত, তার শৈশবের অসহায়ত্বের কথা স্মরণ করা। শৈশবে সে যখন ছিল অসহায়, নিজে নিজে কোনো কাজই সে করতে পারত না, তখন যেমন মাতা-পিতা তাকে হাত ধরে ধরে সব কাজ শিখিয়েছেন, তার সুখের জন্য, তার আরামের জন্য নিজের সুখ-শান্তিকে বিসর্জন দিয়েছেন, সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লে মাতা-পিতা অস্থির হয়ে উঠতেন। এইসব কিছু সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দরদ ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসাপূর্ণ মধুময় সম্পর্ক হলো মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক। যে মাতা-পিতার মাঝে সন্তানের জন্য এত দয়া, এত মায়া, সেই মাতা-পিতাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ কত দয়ালু তাঁর বান্দার প্রতি সেদিকে বান্দার খেয়াল করা দরকার। তাই তো হযরত লোকমান (আ.) তাঁর সন্তানের প্রতি প্রথম নির্দেশ দিচ্ছেন, হে বৎস! শিরক করো না, অবশ্যই শিরক মস্ত বড় জুলুম। শিরক যেমন কবীরা গোনাহ, অনুরূপভাবে মাতা-পিতার নাফরমানী করাও কবীরা গোনাহ। তবে মাতা-পিতার ফরমাবরদারী করতে গিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'খালেকের নাফরমানী করে মাখলুকের ফরমাবরদারী করা যাবে না।' {মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১০৪১}

রাসূলুল্লাহ (সা.) কবীরা গোনাহ কী কী তা বলতে গিয়ে শিরক করা ও মাতা-পিতার নাফরমানী করাকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ।' {বুখারী শরীফ, হাদীস-৫৫১৯}

হযরত জাহেমা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে জিহাদে শরীক হওয়া সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য উপস্থিত হলাম। তখন রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা.) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তোমার মায়ের সম্মান ও খেদমত করতে থাক। কেননা তার পায়ের নিচেই জান্নাত।' {নাসাঈ শরীফ, হাদীস-৩০৫৩}

আজ সমাজে মাতা-পিতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আমরা একেবারেই উদাসীন। দুনিয়ার মোহে পড়ে আমরা সর্বদা ইসলামের বিধানসমূহ জলাঞ্জলী দিচ্ছি। আধুনিকতার বিষবাষ্পে আমরা সন্তানদেরকে ইসলামী ভাবধারা থেকে দূরে ঠেলে দিয়ে দুনিয়ামুখী করে গড়ে তুলছি। এ কারণেই তো আমাদের সন্তানেরা মাতা-পিতাকে একপর্যায়ে 'বোঝা' মনে করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। বৃদ্ধ মাতা-পিতার শেষ আশ্রয় এখন হচ্ছে 'বৃদ্ধাশ্রমে'।

আমাদের সন্তানকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দিয়ে আমরা যেন তাদের কাছ থেকে ইসলামী নিয়মে সম্মান ও মর্যাদা পাই, সেজন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমাদের সন্তানদেরকেও সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

লেখক, মুহাদ্দিস, কারবালা মাদরাসা, বগুড়া। kf.karim@yahoo.com

স্মরণ
আওলিয়া জীবন

শায়খুল হিন্দ হযরত
মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)

আবু নাঈম মুফতী মুঈনুদ্দীন

জন্ম :

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) ১২৬৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা যুলফিকার আলী উসমানী (রহ.)। তাঁর বংশধারা ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উছমান (রা.)-এর সঙ্গে মিলিত হয়।

শিক্ষাদীক্ষা :

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেব (রহ.) কুরআন শরীফ মিয়াজী মঙ্গলূরী সাহেবের কাছে, ফার্সির প্রাথমিক কিতাব মৌলভী আব্দুল লতীফ সাহেবের কাছে, এরপর কুদুরী পর্যন্ত আরবীর প্রাথমিক কিতাব তাঁর চাচা মাওলানা মাহতাব সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। পনের বছর বয়সে তিনি ছাত্তা মসজিদে প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় ভর্তি হয়ে মোল্লা মাহমূদ সাহেবের কাছে পড়াশোনা শুরু করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম ছাত্র। সিহ্যাহ সিত্তা এবং উঁচু পর্যায়ের অন্যান্য বিষয়াবলি সফরে-হজরে সঙ্গে থেকে মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নিকট সমাপ্ত করেন। ১২৮৯ হিজরীতে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে এবং ১২৯০ হিজরী ১৯ যিলক্বদ দস্তারে ফজীলত লাভ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী ও শাহ আব্দুল গণি (রহ.) থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

দারুল উলূমের উস্তাদ :

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)পাঠ্যনিবেশ অবস্থায় ১২৮৮ কিংবা ১২৮৯ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রথম বারই তাঁকে কুতবী, কুদুরী, মুখতাসারুল মা'আনী, হেদায়া, মেশকাত ও তিরমিযী শরীফ পড়াতে দেওয়া হয়। ১২৯৫ হিজরীতে তিনি বুখারী শরীফের দরস দানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি দারুল উলূমের প্রধান শিক্ষক পদে সমাসীন হন।

একটানা চল্লিশ বছর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে তালিমী খিদমাত আঞ্জাম দেন। এমনকি তিনি মাল্টায় বন্দী থাকা অবস্থায়ও তালীমের কাজ ছাড়েননি। মক্কা-মদীনাতেও তিনি তালীমী কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এতে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ে, যাদের সংখ্যা কয়েক হাজার হবে।

পাঠদানের বৈশিষ্ট্য :

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) -এর দরস ছিল অত্যন্ত সাজানো-গোছানো ও পরিপাটি। বিভিন্ন মাদরাসার ফারেগীন মেধাবী ছাত্ররা এমনকি অনেক উস্তাদও অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর দরসে অংশ নিতেন। তাঁর দরসদানকালে কোনো অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথা বলতেন না। মেধাবী ছাত্রদেরকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া এবং দুর্বল ছাত্রদের অবহেলা করা তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী ছিল। কুরআন-হাদীসের আলোচনা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার ও ঝকঝকে। সাহাবা, তাবেয়ীন, চার ইমাম ও ফুকাহা মুজতাহিদীনের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করার সময় মনে হতো সবই তাঁর কাছে ঠোঁটস্থ। তাঁর বর্ণনাভঙ্গীতে কোনো লৌকিকতা স্থান পেত না, যা বলতেন শ্রোতাদের সহজে হৃদয়মূলে সহজে গেঁথে যেত।

আধ্যাত্মিকতা :

শায়খুল হিন্দ (রহ.) আধ্যাত্মিক জগতের এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। একে তো শুরু থেকে তিনি সৎ স্বভাব ও চরিত্রবান ছিলেন, অধিকন্তু মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর স্নেহ ও সাহচর্য এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর বিশেষ দৃষ্টি তাঁকে আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেয়। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) তাঁর রূহানী পরিপক্বতায় সন্তুষ্ট হয়ে খেলাফত প্রদান করেছিলেন। এই মহান নেয়ামত তিনি মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর কাছ থেকেও লাভ করেছেন। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন ইলমে তরীকত ও রূহানীয়্যাতের মিলন মোহনা।

তিনি বেশির ভাগ সময় শিক্ষাদান, অধ্যয়ন ও কিতাব লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যিকির, অযিফা, মোরাকাবা, তাহাজ্জুদ নামায প্রভৃতি নফল ইবাদত তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী ছিল। মাল্টার বন্দিদশায় প্রচণ্ড বরফপাতের সময়ও তাঁর এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি।

উস্তাদের খেদমত :

তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠদান শেষ করে গঙ্গুহে চলে যেতেন এবং হযরতের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও খেদমতে থেকে জুমু'আর নামায পড়ে দেওবন্দ ফিরে আসতেন। তাঁর মাঝে উস্তাদের মর্যাদা, অনুরাগ, ভক্তি এবং উস্তাদের খেদমত করার জযবা ছিল অবাক করার মতো। হযরত গঙ্গুহী (রহ.) যত দিন দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনি কাউকে

বায়'আত করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন, বড়োরা জীবিত থাকা অবস্থায় এ প্রকার সিলসিলা চালু করা আদবের খেলাফ। গঙ্গুহী (রহ.) এর ইন্তিকালের পর মানুষের অনুরোধে তিনি বায়'আত করতে শুরু করেন।

মাল্টার কারাগারে :

১৩৩৫ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) কে মক্কা থেকে তথাকথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় গ্রেফতার করা হয় এবং আরো কিছু ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার করে মাল্টার কারাগারে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁরা মোট তিন বছর চার মাস কারারুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করে অবশেষে ২২ জুমাদাসসানী ১৩৩৮ হিজরীতে কারামুক্ত হয়ে হিন্দুস্তান চলে আসেন। তাঁর সাথে কারাবন্দিদের মধ্যে হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা আযীয গুল, হাকীম নুসরাত হুসাইন এবং মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ প্রমুখ ছিলেন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে :

তিনি ছিলেন শরীয়ত ও তরীকতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) তাঁকে ইলমের বাগান আখ্যা দিতেন। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) নিজের এই মহান উস্তাদকে "শায়খুল আলম" বলতেন। মাওলানা আশেকে এলাহী মিরাঠী তাঁকে "শরীয়ত ও তরীকতের রাজা" উপাধীতে ভূষিত করেন। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) নিজের এই উস্তাদকে "তরীকতের অকুল সমুদ্র" বলতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন :

১৮৫৭ সালের বিপ্লবে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর অপরিসীম অবদান ছিল। এই বিপ্লবে দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর উভয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের পরিচালনায় তিনি ব্যাপকভাগে দায়িত্ব পালন করেন। এই বিপ্লবের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা তথা হযরত গঙ্গুহী (রহ.)-এর গ্রেফতারি, হযরত নানুতবী (রহ.)-এর আত্মগোপন, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর হিজরত ইত্যাদি সবই তাঁর সামনে ছিল। তাই তিনি নতুন উদ্যমে আরো ব্যাপকভাবে আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে ১৩২৭ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দে দস্তারবন্দি জলসা আহ্বান করেন। যাতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক অংশ গ্রহণ করে। জলসার পর এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। তাতে উপস্থিত সুধীবৃন্দের মতবিনিময় হয় এবং পরামর্শের মাধ্যমে 'জমিয়তুল আনসার' নামে এক সংগঠনের গোড়াপত্তন করা হয়। এর কিছুদিন পরে মুরাদাবাদে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার এ মহান ব্যক্তিদেরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এবং সিআইডি মারফত গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে।

জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার প্রতিষ্ঠা :

জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া (যা বর্তমানে দিল্লির কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হযরত ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের একপর্যায়ে ইংরেজদের পণ্য বর্জনের ফতওয়া প্রদান করেন। যার ভিত্তিতে সারা দেশে নাগরীকদের মধ্যে অত্যধিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এমনকি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ করে দেওয়ার জন্য জনগণ তৈরি হয়ে যায়। সে যুগে হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) অসুস্থ ছিলেন। তথাপি তিনি আলীগড় তশরীফ নিয়ে যান এবং জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া (যা পরে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়) এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিপ্লবের ফসল :

১৯১৯ ইংরেজি সালের নভেম্বরে আয়োজিত খেলাফত কনফারেন্সের সময় হযরত মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর নেতৃত্বে বিপ্লবী চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ ওলামায়ে কেরাম এমন একটি সংগঠন করার সিদ্ধান্ত নেন যার মাধ্যমে জনসাধারণের সহযোগিতায় আন্দোলনের একটি পট তৈরি হয়। উক্ত সংগঠনের নাম রাখা হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রহ.) এই সংগঠনের সর্বপ্রথম সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠন ছিল উক্ত বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সংগঠন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রবিহীন আন্দোলন ও বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করে। তাদের পণ্যবর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। শেষ পর্যন্ত এই পন্থায় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সূচিত হয়।

মোট কথা, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শায়খুল হিন্দ (রহ.) দেশ জাতি ও স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সাথে লড়াই করে যান। আবার শরীয়ত ও তরীকতের ক্ষেত্রে অনন্য খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইন্তিকাল :

অবশেষে এই মহাপুরুষ ১৩৩৮ হিজরী ৮ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৯২০ ইং ৩০ নভেম্বর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূত্র :

১। 'হায়াতে শায়খুল হিন্দ' মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন দেওবন্দী (রহ.)
২। 'নকশে হায়াত', হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)
৩। 'আসীরানে মালটা', হযরত মাদানী (রহ.)
৪। 'তাযকারায়ে শায়খুল হিন্দ', মাওলানা আযীযুর রহমান বজনূরী ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রসঙ্গ : বিয়ের মোহর

মুহাম্মদ জিয়াউল হক

পূর্ব নোয়াখোলা, মানিকচর, বাঁশখালী।

জিজ্ঞাসা : ২০০৩ সালে আমাদের এলাকায় একটি বিবাহ সংঘটিত হয়। তাতে মোহরে ফাতেমী ধার্য করা হয়। যার মূল্য আকদের পর তৎকালীন সময়ে ৩৪০০০ টাকা নির্ধারণ করে কাবিন নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু স্বামী আজ পর্যন্ত মোহর আদায় করেনি। কিছুদিন পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে স্বভাবগত দোষের কারণে তিন তালাক দিয়ে দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, স্বামীর জন্য মোহর ৩৪০০০ টাকা আদায় করতে হবে? নাকি বর্তমান বাজারদরে মোহর আদায় করতে হবে।

সমাধান :

যেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত আকদে নেকাহের কাবিন নামার সময় মোহরে ফাতেমী সমপরিমাণ ৩৪০০০ টাকা মোহর ধার্য করা হয়েছে তাই স্বামীর জন্য মোহর হিসেবে উক্ত টাকাই আদায় করা ওয়াজীব। (দুররে মুখতার ৩/১০২, রদ্দুল মুহতার ৩/১০২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১৩/২৪৪)

প্রসঙ্গ : টেলিফোনে বিয়ে

মাও: আবু নাসের

জামিয়া ইসলামিয়া চারিয়া

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

(১) টেলিফোনের মাধ্যমে বিয়ের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

(২) টেলিফোনের মাধ্যমে উকিল বানিয়ে ছেলে অথবা মেয়ের পক্ষ থেকে ইজাব কবুলের দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করার সুরত কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

(১) বিয়ে সহীহ হওয়ার জন্য যেহেতু একত্র বৈঠকে ইজাব-কবুলকারীর উপস্থিতিতে ও দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল হওয়া শর্ত, তাই টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি বিয়ে হলে তা সহীহ হবে না।

(২) টেলিফোনের মাধ্যমে উকিল বানিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করার পদ্ধতি হলো– বিয়ের মজলিসে অনুপস্থিত বর বা কনে কাউকে নিজের পক্ষ থেকে উকিল বানিয়ে দেবে এবং তাকে বলে দেবে যে, আমার বিয়ে অমুকের সাথে করিয়ে দাও। তখন ওই ওকিল দুজন সাক্ষীর সম্মুখে উপস্থিত বর বা কনের সাথে নিজ মুআক্কেলের পক্ষ থেকে ইজাব বা কবুল করে নেবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/২১, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ২/৩০৫) (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মাসিক আল-আবরার মার্চ ২০১২ইং সংখ্যা দেখা যেতে পারে)

প্রসঙ্গ : ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত।

মুফতী মুনীর হুসাইন

কুষ্টিয়া।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের এলাকায় কিছু লামাযহাবী লোক এ কথা বলে বেড়ায় যে, ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত বিদ'আত। কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আমরা এর কারণে বেশ অসুবিধায় আছি। তাই মুহতারাম মুফতী সাহেবের কাছে জানার বিষয় হলো, ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত বিদ'আত কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

সমাধান :

দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা সব সময় কবুল হয়। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময়ের মধ্যে ফরজ নামাযের পরের সময়টি অন্যতম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বিভিন্ন দু'আর উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী দু'আর সময় দুই হাত উঠিয়ে মোনাজাত করা মুস্তাহাব। স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই কোনো কোনো সময় ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করেছেন। উপরন্তু সম্মিলিত দু'আ কবুল হওয়ার সুসংবাদও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধায় ইসলামের সোনালি যুগ হতে অদ্যবধি ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত করার প্রচলন চলে আসছে। তাই ফেকাহবিদগণ ও ওলামায়ে কেরাম ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাতকে মুস্তাহাব ও ভালো কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমতাবস্থায় সম্মিলিত দু'আ নামাযের পর হোক বা অন্য কোনো সময়, বিদ'আত বলা যাবে না। বরং বিদআত বলা মুর্খতা। তবে নামাযের পর এভাবে দু'আ করাকে বাধ্যতামূলক মনে করা বা মাসবুকদের নামাযে বিঘ্ন ঘটার মতো উচ্চৈস্বরে দু'আ করা অনুচিত। (এ'লাউস সুনান ৩/১৫৯, ৩/১৬১, ৩/১৬৪, খাইরুল ফাতাওয়া ১/৩৫৪, ১/৩৫৩,

মা'আরিফুস সুনান ৩/১২২, নূরুল ঈজাহ আলা মারাকিল ফালাহ ১১৬, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ২/১৯৯)

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মোহাম্মদ হানিফ মিয়া

জিজ্ঞাসা :

আমাদের পাড়ার মসজিদের সাথে পারিবারিক কবরস্থান আছে। কিন্তু তাহা চল্লিশ বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে না বা কবর দেওয়া হচ্ছে না। মসজিদে যাঁরা জায়গা দিয়েছেন তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের কবরস্থান। এখন আমরা ওই জায়গা মসজিদের কাজে ব্যবহার বা ওই জায়গাতে মসজিদ বানাতে পারব কি না। যদি মসজিদ নির্মাণ করা যায় তাহলে সবটুকুতে মসজিদ নির্মাণ করতে পারব কি না? পারলে মসজিদের কী কী কাজে তা ব্যবহার করতে পারব। কবরস্থান বা জায়গার মালিকদের কোনো প্রকার আপত্তি না থাকলে বর্ণিত মসজিদ বর্ধিত করার জন্য উক্ত জায়গা ব্যবহার করতে পারব কি না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু উক্ত কবরস্থান পারিবারিক এবং ৪০ বছর পূর্বে তাতে লাশ দাফন করার কারণে লাশ গলে মাটির সাথে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুতরাং প্রয়োজনে মালিকের অনুমতিক্রমে তার পুরো অংশে বা কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ করা বা বর্ধিত করা জায়েয হবে। (উমদাতুল কারী শরহে বোখারী ৪/১৭৯, কেফায়াতুল মুফতী ৭/১৩৫)

প্রসঙ্গ : অনারবী বর্ণে কুরআন শরীফ লেখা ও পড়া

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ

চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় যেমন বাংলা বা ইংরেজি বর্ণমালায় কুরআন লিপিবদ্ধ করা অথবা বাংলা বা ইংরেজি উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা শরীয়ত সম্মত কি না? এতে তিলাওয়াতকারীর গোনাহ হবে কি না?

সমাধান :

আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা বা উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করার মাঝে শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক দিয়ে পরিবর্তন হয়, যা কুরআন বিকৃতির শামিল। বিধায় তা শরীয়ত সম্মত নয়। তা থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক। (আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ২/৩৬৭, জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৮৩, ১/৭৭) ফাতাওয়ায়ে উসমানী ১/২১৮)

প্রসঙ্গ : কেজি ও সেরের মাপে সা'র পরিমাণ।

মুহাম্মদ মিনহাজুল ইসলাম

শহরগাছী, গোবিন্দগঞ্জ,

গাইবান্ধা।

জিজ্ঞাসা :

বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী সের হিসাবে অর্ধ সা' ও পূর্ণ সা'র পরিমাণ কতটুকু? কেজির হিসাবে অর্ধ সা' ও পূর্ণ সা'র পরিমাণ কতটুকু।

সমাধান :

বাংলা সের হিসোবে ১সা এর পরিমাণ সাড়ে তিন সের এবং অর্ধ সা'র পরিমাণ পৌনে দুই সের। আর কেজি হিসাবে ১ সা'র পরিমাণ ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম। আর অর্ধ সা'র পরিমাণ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম। (রদ্দুল মুহতার ২/৩৬৫, উমদাতুল ফিকহ ৩/১৭০, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/৩০৪)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের জামা'আতের সাথে মসজিদে নামায আদায়

জিজ্ঞাসা :

(১) আমাদের এলাকায় সম্প্রতি মসজিদে মহিলাদের জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মসজিদের তৃতীয় তলায় পৃথক সিঁড়ির মাধ্যমে মসজিদে মহিলাদের প্রবেশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাতে তারা জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে পারে। বিষয়টি সম্প্রতি মসজিদের সভাপতি সাহেব ঘোষণা দেন।

(২) আমাদের মসজিদ-সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী বাড়িতে সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে মসজিদের জামা'আতের সাথেই মহিলারা তারাবীহর নামায আদায় করে। এসব কতটুকু শরীয়তসম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধান :

(১) রাসূলুল্লাহ (সা.) মহিলাদের মসজিদ গমনের পরিবর্তে নিজ গৃহের অন্দরমহলে নামায আদায়ের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছেন এবং তাতে অধিক সওয়াব লাভের কথা জানিয়েছেন। তাই মহিলাদের জন্য মসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়ার সকল আয়োজন শরীয়ত বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। (ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ১/১৩১, এর জন্য মাসিক আল-আবরার মার্চ ও এপ্রিল সংখ্যাও দেখা যেতে পারে)

(২) মহিলাদের জন্য ফরজ নামাযের জামা'আতে শরীক হওয়া যেখানে নিষিদ্ধ, সেক্ষেত্রে যে কোনোভাবে তারাবীহর জামা'আতে শরীক হওয়াও নিষিদ্ধ। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৬৬)

প্রসঙ্গ : ওমরা পালনে হজ্ব ওয়াজীব হওয়া

মুফতী জাফর আহমদ

দামপাড়া, ব্যাটারিগলি মাদরাসা
চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসা :

জনৈক ব্যক্তি ওমরাহ পালনের জন্য রমাজান মাসে মক্কা শরীফ যায় এবং শাওয়াল মাসের কিছুদিন সে ওখানে অবস্থান করে। ইত্যবসরে উক্ত ব্যক্তির ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং দেশে ফিরতে হয়। এক্ষেত্রে জানার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির ওপর হজ্ব ফরজ হয়েছে কি না? ফরজ হলে তা কিভাবে আদায় করবে?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যদি পূর্বে হজ্ব না করে থাকে তাহলে তার ওপর হজ্ব ফরজ হয়ে যাবে। এখন যদি সেই ব্যক্তি ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এ বছর হজ্ব আদায় করতে না পারে তাহলে সে সম্ভব হলে অন্যের মাধ্যমে মক্কা শরীফ থেকে হলেও বদলি হজ্ব করাবে। অবশ্য পরে সক্ষম হলে নিজেই আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় পূর্ববর্তী বদলি হজ্ব নফল হিসেবে গণ্য হবে। (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৪১, রদ্দুল মুহতার ৩/৪৫৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৯)

প্রসঙ্গ : জরায়ু ভাড়া করে সন্তান নেওয়া

মাজহারুল ইসলাম
ক/৩৫, কুড়াতলী
ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

বর্তমান বহির্বিশ্বে জরায়ু ভাড়া করে সন্তান নেওয়ার রেওয়াজ ধুমধাম করে চলতে শুরু করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় গোপনভাবে চললেও বর্তমানে এই ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে। এটা সাধারণত যাদের স্ত্রীদের বাচ্চা হয় না সে সমস্ত নারী ওই সমস্ত পুরুষের কাছে গিয়ে সংগমের মাধ্যমে বীর্য গ্রহণ করে বাচ্চা নেয়, যাদের প্রজনন ক্ষমতা আছে।

দ্বিতীয় পন্থা হলো স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বাচ্চা উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে স্বামী অন্য নারীর জরায়ু ভাড়া করে অর্থাৎ এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে আমার যতক্ষণ না একটি সন্তান তোমার গর্ভে না আসে তত দিনের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা তোমাকে দেওয়া হবে। এবং বাচ্চা জন্মানোর পর ওই সন্তান আমি নিয়ে নেব। এর শরয়ী বিধান কী?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতিতে বাচ্চা নেওয়া স্পষ্ট যিনা-ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। বিধায় তা সম্পূর্ণ হারাম। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৬/৩৯১, ৩৯২, ফাতাওয়ায়ে শামী ৪/৪, ৩/৬৫৩)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের পর্দা

সাধারণ মুসল্লিগণ
জান্নাতুল বাকী মসজিদ
নওগা পৌরসভা, নওগা।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের কিছু কথা ও কার্যকলাপ আমাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। বিষয়গুলোর ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা জানিয়ে বাধিত করবেন।

(১) সূরা নূরের ৩১ নং আয়াত অনুযায়ী মহিলারা মুখ এবং হাতের তুলু খোলা রেখে বের হতে পারবে। (২) মহিলাদের চেহারা বস্তার মতো ঢেকে বাইরে বের হতে হবে কুরআন শরীফের কোথায় লেখা আছে? (৩) এর পাশাপাশি ইমাম সাহেব কালো খেজাব ব্যবহার করেন। উনার দাবি হলো ভারত থেকে আমদানিকৃত এক ধরনের কালো তেল। উল্লেখ্য, তার বয়স প্রায় ৬০ বছরের কাছাকাছি এবং তার স্ত্রীও বয়স্কা।

সমাধান :

(১-২) কুরআন শরীফের সূরা আহযাবের ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্ট আদেশ অনুযায়ী মহিলারা একান্ত অবশ্যকীয় ও শরীয়ত সম্মত প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে অবশ্যই জিলবাব অর্থাৎ এমন বোরকা বা ওড়না দ্বারা পর্দাবেষ্টিত হয়ে বের হতে হবে, যা মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে নেয়। (সূরায়ে নূর আয়াত ৩১, ৫৩, রূহুল মা'আনী ১১/২৬৪, আহকামুল কুরআন ৬২৫, আদ্দুররুল মুখতার ১/৪০৬ ইত্যাদি)

(৩) নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাদা হওয়া চুল /দাড়ি পরিপূর্ণ কালো করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত তেল ব্যবহারেরও অনুমতি নেই। বিধায় যে ব্যক্তি এমন কাজে লিপ্ত হবে সে উক্ত কাজ পরিহার করে তাওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহ হবে। (মুসলিম শরীফ ২/১৯৯, সুনানে নাসায়ী ২/২৩১, আল মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা ২/২৮০, কেফায়াতুল মুফতী ৯/১৭৯ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গ : জানাযা

আব্দুর রহমান
সিরাজগঞ্জ।

জিজ্ঞাসা :

(ক) জানাযার নামাযের জন্য কিছু মানুষ একত্রিত হয়েছে। এমতাবস্থায় জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। তখন নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিতব্য জোহর নামাযের আগে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কি না।

জানাযা এসেছে ১২.৪৫ মিনিটে। জনৈক মুফতী সাহেব জোহরের নামায আগে এবং জানাযার নামায পরে পড়ার কথা বলেছেন, ফরজে আইন এবং ফরজে কিফায়া হিসেবে। এখন তাঁর কথা

কতটুকু শরীয়ত সম্মত হয়েছে সবিস্তারে জানতে চাই।

(খ) বিতর নামায রমাজান ছাড়া অন্য মাসে জামা'আতের সাথে পড়া যাবে কি না? যদি পড়ে ফেলে ওই নামাযের কী হুকুম?

সমাধান :

(ক)যদিও ফরজে আইনের গুরুত্ব ফরজে কিফায়ার চেয়ে অনেক বেশি তথাপি ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্যমতে যদি ফরজ নামাযের জামা'আতের আগে এতটুকু সময় বাকি থাকে যে, তাতে জানাযার নামায পড়ার কারণে ফরজ নামাযের ব্যবস্থাপনায় কোনো সমস্যা হবে না, তাহলে ফরজ নামাযের পূর্বেই জানাযার নামায পড়ে নেবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় জোহরের নামাযের পূর্বে এ পরিমাণ সময় থাকায় উক্ত সময় জানাযার নামায পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। (আদ্দুররুল মুখতার ২/১৬৭, খাইরুল ফাতাওয়া ৩/২৮২)

(খ) রমাজান মাস ছাড়া অন্য সময়ে জামা'আতের আয়োজন করা, তিনজনের চেয়ে বেশি নিয়ে বিতরের নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয। তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। (আদ্দুররুল মুখতার ২/৪৮, আলবাহরুর রায়েক ২/৭০, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৪/৩৯৯)

প্রসঙ্গ : শেয়ার ব্যবসা

মাও: মুহিউদ্দীন

কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

আমি একজন শেয়ার ব্যবসায়ী। কোনো ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে শেয়ার কিনতে চাইলে টাকার প্রয়োজনে ওই ব্যাংক নির্ধারিত লাভের বিনিময়ে লোন দিয়ে থাকে। এই নির্ধারিত লাভ সুদ হবে কি না? দাতা ও গ্রহীতা সুদের লানতের ভাগি হবে কি না?

সমাধান :

যে স্থানে শেয়ারের কেনাবেচা হয় সে স্থানকে ব্রোকার হাউস বলা হয়। সরকারিভাবে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শেয়ারের বেচাকেনা করতে হয়। লাইসেন্স দুই প্রকারের হয়ে থাকে।(১) ডিলার লাইসেন্স (২) ব্রোকারি লাইসেন্স। যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে ডিলার লাইসেন্স আছে তারা যদি শরীয়ত অনুমোদিত শেয়ার কিনে আর খরিদদারের কাছে বাকিতে বা নগদে বিক্রয় করে ওই বিক্রয়ের লভ্যাংশ নিঃসন্দেহে হালাল হবে, সুদ হবে না।

ব্রোকারি লাইসেন্সের অর্থ হলো, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান শেয়ারের মালিক হয় না বরং যার জন্য ক্রয় করা হয় সেই মালিক হয় আর লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান শুধু কমিশন নিয়ে থাকে। কোনো লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত লাভের বিনিময়ে খরিদদারকে নির্ধারিত লাভের ওপর বিনিয়োগ দিলে সেই লাভ নিঃসন্দেহে সুদ হয়। দাতা-গ্রহীতা উভয়ে সুদের লানতের ভাগি হয়।

(এ বিষয়ে আগামীতে সবিস্তারে লেখা হবে ইনশাআল্লাহ)

চশমার জগতে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত

মেহবুব অপ্টিক্যাল কো.

এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

পাইকারী ও খুচরা দেশী বিদেশী চশমা সুলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়।

১২ পাটুয়াটুলি রোড, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০২- ৭১১৫৩৮০ , ০২- ৭১১৯৯১১

১৩ গ্রীন সুপার মার্কেট, গ্রীন রোড, ঢাকা, ১২১৫
ফোন : ০২-৯১১৩৮৫১

ইসলামে টুপির গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মাওলানা রিজওয়ান জমীরাবাদী

মানুষ বলতেই নতুনের প্রতি আগ্রহী, নতুনত্বের জন্য অতি উৎসাহী। নতুন বা নতুনত্বে যদি কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় তখন তো কোনো কথাই নেই, কোনো বাছবিচার ছাড়াই তা গ্রহণ করে ফেলে। এটি মানুষের স্বভাবজাত বিষয় হলেও মুসলমানগণ সেরূপ হতে পারেন না। কারণ মুসলমানদের রয়েছে নিপূণ আদর্শ, ধর্মীয় জ্ঞান। ধর্মীয়ভাবে তাদের রয়েছে বহু বিধিনিষেধ। এ কারণে যুগ যুগ ধরে মুসলমানগণ এরূপ হঠকারিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তই ছিলেন এবং আছেন। তথাপি যুগের ঘূর্ণায়নে স্বভাব প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার বিপ্লব ঘটে থাকে, পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পার্থিব বিষয়ে তো আছেই, সম্প্রতি ধর্মীয় বিষয়েও নগণ্য সংখ্যক মুসলমানদের মাঝে এরূপ একটি উদার স্বভাব লক্ষ্য করা যাচেছ। ধর্মীয় বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে কোনো আধুনিক বার্তাবাহক নতুন কিছুর অবতারণা করলেই হয়, তারা তা পালনের জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য ধর্মীয় কর্ণধার উলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে এসে বিষয়টি বুঝে নিতে সক্ষম হলে অনেকে তা থেকে ফিরে আসেন। এ কারণে বলতে হয়, যে কোনো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র বিষয় হলেও তা যদি নতুন হয়, তবে যাচাইবাছাই না করে তা গ্রহণ করা কারো জন্য উচিত নয়।

যেমন ধরুন হযরত রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ ও সুন্নাত হিসেবে টুপি পরে আসছেন এবং পরিধান করছেন। যারা সব সময় পরিধান করতে পারছেন না তাঁরাও অন্তত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, বা কোথাও আলেম উলামাদের সাথে বসতে হলে, নামাযে, যিকিরে ইত্যাদিতে টুপি পরিধান করে থাকেন। আবার অনেকের মাঝে সর্বদা টুপি পরতে না পারার আফসোসও সক্রিয় থাকে। সে আফসোস আল্লাহর কাছে কবুল হলে ইনশাআল্লাহ অনেক উপকারের ভাগি হবেন তাঁরা।

এ ক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানদের মধ্যেই একটি বিশেষ শ্রেণী বলে বেড়াচ্ছে টুপি পরার কোনো বিধান শরীয়তে নেই। হাদীসে নেই। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এটি সুন্নাত নয়। ইত্যাদি বাহারি বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা। শুধু কি টুপি? আরো বহু ধর্মীয় বিধানাবলি তাদের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের শিকারে পরিণত।

মুসলমানদের টুপি না পরে নামায আদায়ে অভ্যস্ত বানানোর জন্য তাদের মিশন দুভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে তাঁরা মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে উল্লিখিত অপপ্রচার চালাতে থাকে। অন্যদিকে এমন উৎসাহ উদ্দীপনায় তারা টুপিবিহীন খোলামাথায় মসজিদসমূহে এসে নামায আদায় করে থাকে। মনে হবে টুপি ছাড়া নামায আদায়ই ইসলামের মূল আদর্শ। তাদের দেখা দেখি এবং তাদের প্রচারণায় কিছু যুবসমাজও এখন টুপি ছাড়া নামায আদায়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়।

তাদের বাহ্যিক দাবি হলো, কুরআন-হাদীসের দলিল ছাড়া তাঁরা কিছুই করেন না। অথচ টুপি ছাড়া নামায আদায় করার সামান্যতম স্বীকৃতি কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। টুপি ছাড়া নামায পড়তে না কুরআন পাকের কোনো আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছে, না নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টুপি ছাড়া নমায আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। বরং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরো যিন্দেগীতে স্বাভাবিক অবস্থায় একবারও খালি মাথায় নামায আদায় করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

টুপি পরিধান করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। টুপি মুসলমানদের পরিচায়ক পোশাক, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবেতাবেঈন এবং সে থেকে এ পর্যন্ত ইসলামের ধারকবাহক ইমাম, মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ওলামায়ে আকাবের এবং আসলাফের পছন্দনীয় পোশাক। স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনগণ টুপি পরেছেন এবং নামাযেও নিয়মিত টুপি পরিধান করতেন। এর পূর্বেও যদি আমরা চোখ বুলিয়ে দেখি তবে দেখা যায়, টুপি পরিধান পূর্বেকার নবীগণেরও সুন্নাত ছিল। হযরত ইমাম তিরমিযী (রহ.) টুপি সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন–

عن عبد الله بن مسعودؓ قال كان على موسى يوم كلمه ربه كسا صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار الكمة القلنسوة الصغيرة۔

(ترمذى ٤/١٩٦، رقم الحديث ١٧٣٤)

"হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যেদিন হযরত মূসা (আ.) নিজের রব-আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেছিলেন সেদিন তাঁর গায়ে একটি পশমের চাদর, পশমের জুব্বা, পশমের টুপি ও পশমের সালোয়ার ছিল এবং তাঁর জুতো ছিল গাধার খাল দিয়ে তৈরি।" (তিরিমিযী ৪/১৯৬ হাদীস নং ১৭৩৪)

এই হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুসা (আ.)-এর সর্বোত্তম লেবাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল টুপি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও খোলা মাথায় থাকতেন না :

যদি মাথা খোলা রাখাই উত্তম আমল বা সুন্নাত কিংবা জরুরি বিষয় হতো তবে

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও মাথায় টুপি, পাগড়ি বা কোনো কাপড় পরিধানকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করতেন না। টুপি-পাগড়িকে তাঁর পোশাকের অংশরূপে গ্রহণ করতেন না। হাদীস শরীফে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথা মোবারকে পাগড়ি থাকার কথা এত বেশি বর্ণিত আছে, যা থেকে পাগড়ি পরিধানও জরুরি বলে অনুমিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

(১) "হযরত যাবের (রা.) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মক্কায় প্রবেশ করার সময় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (শামায়েল- পৃষ্ঠা-৮)

(২) হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাথা মোবারকে কালো পাগড়ি দেখেছি। (শামায়েল ৮)

(৩) তাঁরই আরেকটি বর্ণনায় আছে, খুতবা দেওয়ার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথায় পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। (শামায়েল ৮)

(৪) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন পাগড়ি পরিধান করতেন তখন পাগড়ির শামলাকে নিজের দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে দিতেন। (শামায়েল-৮)

(৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একসময় খুতবা দিলেন এবং তাঁর মাথা মোবারকে কালো বর্ণের পাগড়ি ছিল অথবা চিকন পট্টি ছিল। (শামায়েল-৮)

এ ছাড়াও হাদীসের কিতাবাদিতে সাহাবায়ে কেরাম থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাগড়ি সম্পর্কে এত বেশি হাদীস বর্ণিত আছে, যা থেকে অনুমান করা যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথা মোবারককে সব সময় আবৃত রাখতেন, পাগড়ি-টুপি দ্বারা হোক বা অন্য কাপড় পরিধান করে হোক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও এবং কোনো সময় মাথা খোলা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন না।

পাগড়ি পরিধানের ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশসূচক বাণী :

পাগড়ি পরিধানের জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশসূচক বাণীও মারফূ ও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, اعتموا تزدادو حلما "তোমরা পাগড়ি পরিধান করো এবং গাম্ভীর্যতা ও ভদ্রতার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাও।" (তাবারানী কাবীর ১/১৯৪, ফতহুল বারী ১০/৩৩৫)

আরেক হাদীসে আছে : হযরত রুকানা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য হলো টুপির ওপর পাগড়ি পরিধান করা। (তিরমিযী ৪/২১৭ হাদীস নং ১৭৮৪) আবু দাউদ ৪/৪১১ হাদীস নং ৪০৭৫)

এ সকল বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে পাগড়ি পরিধান করতেন, আবার তা পরিধান করার জন্য উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। পাগড়ির সাথে টুপি পরিধানকে মুসলমান এবং অমুসলিমদের মধ্যকার পার্থক্য বিধানকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাতে বোঝা যায়, টুপি পরিধান করা মুসলমানদের প্রতীকী পোশাক।

টুপি সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস :

عن عبد الله بن عمرؓ قال كان رسول الله ﷺ يلبس قلنسوة بيضاء (مجمع الزوائد ٥/٢١١)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা টুপি পরিধান করতেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/২১১)

عن عائشةؓ قالت كان رسول الله ﷺ يلبس قلنسوة بيضاء لاطية (كنزالعمال ١٢١/٧)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাদা টুপি পরিধান করতেন, যা মাথা মোবারকে লেগে থাকত। (কানযুল উম্মাল ৭/১২১, হাদীস নং ১৮২৮৫)

قال الحافظ العراقى فى شرح الترمذى واجود اسناد فى القلانس ماروراه ابو الشيخ عن عائشة كان يلبس القلانس فى السفر ذوات الاذن وفى الحضر المضرة يعنى الشامية

(فيض القدير شرح جامع الصغير ٤٩٤٢/٩، رقم الحديث ٧١٦٨، كنز العمال ١٢١/٧)

হাফেজ ইরাকী তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন, টুপি সংক্রান্ত সবচেয়ে উচ্চমানের সনদের হাদীস হলো যা, হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফর অবস্থায় দুই কানবিশিষ্ট টুপি পরিধান করতেন এবং অন্য সময় শামী টুপি পরিধান করতেন। (ফয়জুল কৃদীর শরহে জামেউস সাগীর ৫/২৪৬, হাদীস নং৭১৬৮)

عن ابن عباسؓ كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم وكان يلبس القلانس اليمانية ويلبس ذوات الاذن فى الحرب وكان ربما نزع قلنسوة فجعلها سترة بين يديه وهو يصلى (كنز العمال ١٢١/٧ رقم الحديث ١٨٢٨٦)

হযরত ইবনে আববাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাগড়ির নিচে টুপি পরিধান করতেন, পাগড়ি ছাড়াও টুপি পরিধান করতেন এবং তিনি ইয়ামেনি টুপি পরিধান করতেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দুই কানবিশিষ্ট টুপি পরিধান করতেন, কোনো কোনো সময় টুপি খুলে তা দ্বারা সুতরা বানিয়ে নামায আদায় করতেন। (কানযুল উম্মাল ৭/১২১)

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, টুপি পরিধান করা রাসূল (সা.)

এর অন্যতম সার্বক্ষনিক একটি সুন্নাত।

টুপি সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনের সুন্নাত :

عن عمر بن الخطابؓ يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول الشهداء اربعة رجل مومن جيد الايمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذاك الذى يرفع الناس اليه اعينهم يوم القيامة هكذا و رفع راسه حتى وقعت قلنسوته فلا ادرى قلنسوة عمر اراد ام قلنسوة النبى ﷺ (ترمذى ٤/١٥٢ رقم الحديث١٦٤٤)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, শহীদগণ চার প্রকারের, প্রথমত সেই মুমিন ব্যক্তি যার ঈমান পাকা, যে দুশনের সাথে মোকাবেলায় আল্লাহর সামনে ঈমানের পরিচয় দেয় এবং শহীদ হয়ে যায়। সে ওই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে যার প্রতি মানুষ মাথা উঁচিয়ে এভাবে দেখবে। এই বলে তিনি এমনভাবে মাথা উঠালেন যে, তাঁর টুপি মাটিতে পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই, হযরত উমর (রা.)-এর টুপি নিপতিত হওয়া উদ্দেশ্য, নাকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর টুপি। (তিরমিযী ৪/১৫২ হাদীস নং ১৬৪৪)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় হযরত উমর (রা.)ও টুপি পরিধান করতেন।

عن هلال بن يسافؓ قال قدمت الرقة فقال لى بعض اصحابى هل لك فى رجل من اصحاب النبى ﷺ قال قلت غنيمة فذهبنا الى وابصة رضى الله عنه قلت لصاحبى نبذ افننظر الى دله فاذا عليه قلنسوة لاطية ذات اذنين وبرنس خز اغبر واذا هو معتمد على عصا فى صلاته (سنن ابوداود ٢/٤٠ رقم الحديث ٩٤٥)

হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রিক্কা (সিরিয়ার একটি শহরের নাম) গেলাম। আমাদের কিছু সাথি বলল, আচ্ছা তুমি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করবে! আমি বললাম, এটি বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়। অতঃপর আমরা হযরত ওয়াবিসা (রা.)-এর কাছে গেলাম। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, আমরা প্রথমে তাঁর রীতিনীতি দেখি। অতঃপর আমরা দেখলাম! তাঁর মাথায় দুই কানবিশিষ্ট মাথার সাথে লাগোয়া একটি টুপি আছে এবং একটি ধুলামলিন লম্বা টুপি (এর উপর) পরিহিত আছে এবং তিনি লাঠির উপর ভর করে নামায আদায় করছেন। (আবু দাউদ ২/৪০, হাদীস নং ৯৪৫)

عن سفيان بن عيينةؓ قال رأيت شريكا صلى بنا بعد جنازة العصر فوقع قلنسوته بين يديه- (ابو داود ١/٤٦٧ رقم الحديث ٦٩١)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রা.) বলেন, আমি হযরত শুরাইক (রা.)কে একটি জানাযার পর আসরের নামায পড়াতে দেখেছি। তখন তাঁর টুপি তার সামনে নিপতিত হল। (আবু দাউদ ১/১০০, ১/৪৬৮ হাদীস নং৬৯১)

عن عبد الله بن سعيدؓ قال رأيت على على بن الحسين قلنسوة بيضاء مصرية (مصنف ابن ابى شيبة ٥/١٧٠ رقم الحديث ٢٤٨٤٥)

আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা.) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে হুসাইন (যায়নুল আবেদীন) কে মিসরি সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/১৭০ হাদীস নং২৪৮৪৫)

عن هشام قال رأيت على ابن الزبير قلنسوة لهارب كان يستظل بها اذا طاف بالبيت (مصنف ابن ابى شيبه ٥/١٧٠ رقم الحديث ٢٤٨٤٦)

হযরত হেশাম বর্ণনা করেন, আমি ইবনে যুবাইরকে একটি ছজ্জা বিশিষ্ট টুপি পরিধান করতে দেখেছি। তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করার সময় এর দ্বারা ছায়া গ্রহণ করতেন।(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/১৭০ হাদীস নং২৪৮৪৬)

عن يزيدؓ قال رايت على ابراهيم النخعى قلنسوة مكفوفة بثعاب او سمور(مصنف ابن ابى شيبه ٥/١٧٠ رقم الحديث ٢٤٨٤٧)

হযরত ইয়াযীদ (রা.) বলেন, আমি ইবরাহীম নখয়ী (রা.) কে ঝালর বিশিষ্ট টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/১৭০ হাদীস নং২৪৮৪৭)

عن اشعث عن ابيهؓ ان ابا موسى خرج من الخلاء وعليه قلنسوة فمسح عليه (مصنف ابن ابى شيبة ٥/١٧٠ رقم الحديث ٢٤٨٤٩)

হযরত আশআছ (রা.) নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মূসা হাম্মাম থেকে বের হলেন, এমতাবস্থায় তিনি টুপি পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং ওই টুপির ওপর মসেহ করলেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৫/১৭০ হাদীস নং ২৪৮৪৯)

টুপির ধরন :

عن ابى كبشة قال كان كمام اصحاب رسول الله ﷺ بُطحا (ترمذى ٢/ ٢١٦)

كمام بكسر الكاف جمع كمة بالضم كقباب وقبة وهى القلنسوة المدورة سميت بها لأنها تغطى الرأس وبطحا جمع بطحاء اى كانت مبسوطة على رؤسهم لازقة غير مرتفعة عنها وقيل هى جمع كم بالضم اى كانت عريضة واسعة (المرقاة ٨ /٢٠٩)

হযরত আবু কবশা (রহ.) বলেন সাহাবায়েকেরামের টুপি গোল এবং মাথার সাথে লাগানো ছিল, উঁচু ছিল না। (তিরমিযী ১/২১৬, মিরকাত ৮/২০৯)

নামাযেও টুপি পরিধান করতে হবে :

এ পর্যন্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হলো মাথা ঢেকে রাখা, টুপি পরিধান করা ইত্যাদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের সচরাচর আমল ছিল এবং টুপি ছিল তাঁদের পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যে অংশ ছাড়া তাঁদের পোশাক পরিপূর্ণ ছিল না। তাহলে নামায অবস্থায় টুপি পরিধান করার বিষয়টি এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

যেহেতু নামাযে টুপি না পরার বিষয়ে

ওই বিশেষ মহলটি খুবই জোর গলায় বলে থাকে তাই ভিন্নভাবে বিষয়টি আরো মজবুত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

সুন্দর ও উত্তম লেবাস পরে মসজিদে আসার হুকুম :

মসজিদে নামায পড়তে আসা লোকদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলা কি সুন্দর হুকুম দিচ্ছেন–

يٰبنى ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد (سوره اعراف ٣١)

"হে আদম সন্তান তোমরা মসজিদে যাওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করো।"(সূরা আরাফ ৩১)

পোশাক সুন্দর ও শোভাময় হবে পরিপূর্ণ হওয়ার পর। যেখানে লেবাস পরিপূর্ণই নেই সেখানে সুন্দর ও শোভাময় হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উপরে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মাথায় টুপি পরিধান করা মুসলমানদের লেবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি টুপি না পরা হয় তবে লেবাস পরিপূর্ণই হলো না। যে লেবাস পরিপূর্ণই হলো না সে লেবাসকে সুন্দর ও শোভাময় বলার অবকাশ থাকে না। তাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো নামাযে যাওয়ার সময় পরিপূর্ণ লেবাস পরে নিজেকে দেখতে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শোভাময় করে মসজিদে যাওয়া। সুতরাং টুপিও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারা জীবন যে লেবাসই পরিধান করেছেন তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল টুপি।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে–

عن انس رضى الله تعالى عنه ان النبى ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغفر (بخارى ٧/١٥، رقم الحديث ٥٨٠٨)

"হযরত আনাস (রা.) সূত্রে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন (মক্কায়) প্রবেশ করলেন, তাঁর মাথায় মিগফার ছিল। (বুখারী ৭/৫১, হাদীস নং ৫৮০৮)

المِغفر : অর্থ - টুপির নিচে পরিধেয় বর্ম বিশেষ। زرد ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة বা মাথার হেফাজতের জন্য টুপির নিচে পরিধেয় বর্মবিশেষ। (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার ৪/৫৯৮, উমদাতুল ক্বারী ১৫/২৬, ফতহুল বারী ৪/৭২, আউনুল মাবূদ ৭/১৬৮, আলকামুসুল মুহীত ২/১৮৪, মুখতারুসসিহাহ ২২৩, লিসানুল আরব ১০/৯২, আররায়েদ ১০৮৩, মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা ৪৪৪ ইত্যাদি)

এই হাদীস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় টুপি নবীজির পোশাকের একটি দায়েমী অংশ।

عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يارسول الله مايلبس المحرم من الثياب قال رسول الله ﷺ : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الخ (بخارى ١/٥٢، رقم الحديث١٣٤)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, মুহরিম কি পোশাক পরিধান করবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, কমীস, পাগড়ি, সালোয়ার এবং টুপি পরিধান করবে না...।(বুখারী শরীফ ১/৪৩১ হাদীস নং ১৩৪)

এই হাদীসে মুহরিমকে এমন স্বভাবজাত কিছু পোশাক থেকে বিরত থাকার জন্য বলা হচ্ছে যেগুলো তৎকালীন মুসলমান গণের নিত্যদিনের পোশাক ছিল। টুপি যে, তাঁদের নিত্যদিনের পোশাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা প্রমাণ করার জন্য এ একটি হাদীসই যথেষ্ট। সুতরাং হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, এহরাম অবস্থায় টুপি পরিধান করবে না। (তা ছাড়া নামাযে হোক বা অন্য সময় টুপি পরিধান করবে)

ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন,

وضع ابو اسحاق قلنسوته فى الصلوة ورفعها (بخارى شريف ٢/٣٦٣)

হযরত ইমাম আবু ইসহাক নামাযে নিজের টুপি রাখলেন আবার উঠালেন। (বুখারী শরীফ ২/৩৬৩)

আরেক হাদীসে আছে–

عن عاصم ابن كليب عن ابيه عن خاله قال اتيت النبى ﷺ فى الشتاء فوجدتهم يصلون فى البرانس والا كسية وايديهم فيها (مجمع الزوائد ٢/٥١)

"হযরত কুলাইব এর পিতা আপন মামা থেকে বর্ণনা করেন, আমি শীতের মৌসুমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তাঁরা সকলে টুপি পরিহিত, চাঁদর ঝুলানো অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন এবং তাঁদের হাত চাঁদরের ভেতরে ছিল। (মজমাউযযাওয়ায়েদ ২/৫১)

এ সকল দলিলাদি থেকে কয়েকটি বিষয় বোঝা যায়। যথা–

১। টুপি মুসলমানদের শে'আর বা প্রতীকী বিষয়।

২। টুপি পরিধান করা মুসলমানদের সার্বক্ষণিক সুন্নাত।

৩। টুপি নবী (সা.)-এর নিয়মিত পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৪। যেহেতু নবী (সা.)-এর পোশাক টুপি সেহেতু টুপি সর্বোত্তম পোশাকের অন্তর্ভুক্ত।

৫। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো সময় নবী (সা.) টুপি ছাড়া নামায আদায় করতেন না।

৬। টুপি গোল, অনুচ্চ এবং মাথার সাথে লাগানো হতে হবে।

৭। নবী (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তবে তাবেঈন, ইমাম-মুজতাহিদ, মুহাদ্দিসগণ সকলে টুপি পরিধান করতেন। যা একটি মোতওয়াতের আমল।

কুরআন, হাদীস ও আমলী তাওয়াতুরের দলিলের ভিত্তিতে ফিকহবিদগণ বলেন, টুপি পরিধান করা নামাযের আদব। যদি হঠাৎ কোনো সময় টুপি পরতে ভুলে যায় তবে সমস্যা নেই। কিন্তু গাফিলতি করে তা পরিহার করা গোনাহ। তবে যদি হেয় প্রতিপন্ন করে বা হঠকারিতার বশবর্তি হয়ে তা পরিহার করা হয় তবে কুফরীর আশংকা রয়েছে। (শামী১/৪৭৪)

টুপি নিয়ে এত বিদ্রুপ কেন ?

এখন প্রশ্ন হলো, টুপির ব্যাপারে এত

দলিল থাকা সত্ত্বেও ওই বিশেষ মহলটি টুপি নিয়ে এত উচ্চবাচ্য করে কেন?

কেন করা হয় তার উত্তর তারাই ভালো জানে এবং আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম জ্ঞাত। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, তারা যেমন এক দিকে টুপি না পরার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে থাকে অন্য দিকে 'টাই' পরার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। তাদের ঘরানারই একজন বড়পণ্ডিত, লেকচারার, মিডিয়ার বরকতে সম্প্রতি যার নামডাক সারা দুনিয়াতেই, তিনি সব সময় টাই পরিধান করে থাকেন (অবশ্য মাথায় টুপিও থাকে) টাইয়ের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হলো এটি কালচারাল পোশাক। টাই অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। তাঁদের এহেন বক্তব্য থেকেই বুঝে নেওয়া যায় তাদের উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

তা বুঝার জন্য পোশাক সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাতের দাবি রাখে। পোশাকের বিষয়টি একমাত্র সভ্যতা, সাংস্কৃতিক বা কালচারাল বিষয় নয়। বরং এটি দ্বীনি বিষয়। কারো পক্ষে এ কথা বলার কোনোই অবকাশ নেই যে, পোশাকের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ পোশাক সম্পর্কে শরীয়তের বিভিন্ন স্পষ্ট বিধান ও শিক্ষা রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يبنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا (اعراف ٢٥)

হে বনী অদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র...।

হাদীস শরীফেও লেবাস-পোশাক সম্পর্কে বহু বিধিবিধান রয়েছে। পোশাক ধর্মীয় নিদর্শনও বটে। ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট রং ও রূপের পোশাক ওয়াজীব বা ফরজ করে না দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, পোশাকের ব্যাপারে মুসলমানগণ পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং পোশাককে নিছক কালচারাল বা সাংস্কৃতিক বিষয় বলে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

শরীয়ত কিছু কিছু পোশাককে পুরুষের জন্য হারাম করেছে, কোনো প্রকার পোশাককে ইহুদী-খ্রিস্টানদের পোশাক বলা হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে পোশাক পরার পদ্ধতিতে সীমারেখা ঠিক করে দিয়েছে। এগুলো হলো শরীয়তের আংশিক বিধান। এর পাশাপাশি মৌলিক বিধান হলো–

من تشبه بقوم فهو منهم তথা অন্য সম্প্রদায় বা ধর্মীয় লোকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর অনুসরণ বা নবী (সা.) যে কাজটি যেভাবে করেছেন, সেভাবে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং উৎসাহিত করা হয়েছে। পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের সামগ্রিক বিধানাবলি একত্র করা হলে বোঝা যাবে, টুপি পরিধানে অনুৎসাহিত করা এবং টাইকে কালচারাল পোশাক বলে বৈধ করে নেওয়ার মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে।

'তাশাব্বুহ' অর্থ হলো নিজের রূপকে পরিবর্তন করে অন্য সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কাফির মুশরিকদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পোশাক গ্রহণের আড়ালে তাদের ধর্ম, বড়ত্ব ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

এটি কতবড় জুলুম(?) একদিকে ঈমানের দাবি করা হবে, নবীজি (সা.) -এর মুহাববতের দাবি করা হবে অন্যদিকে রূপ ও সাদৃশ্য বিধর্মীদের গ্রহণ করা হবে!

হযরত উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে যখন রাজ্যের সীমানা খুবই প্রশস্ত হয়ে গেল, তখন তিনি ভাবলেন আজমীদের সংশ্রবের কারণে যেন ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলির মধ্যে কোনো প্রকার ফারাক পড়ে না যায়। সে জন্য মুসলমানদেরকে ভিন্ন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আবার ভিন্নজাতির লোকদেরকেও মুসলমানদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করার নির্দেশ দিলেন। যেমন বুখারী শরীফে আছে, হযরত উমর (রা.) পারস্যে অবস্থানরত মুসলমানদের উপর মুশরিক ও কাফিরদের পোশাক গ্রহণ না করার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করেন। উক্ত পণ্ডিতের দাবী অনুযায়ী আপাতত ধরে নিলাম, 'টাই' অমুসলিমদের ধর্মীয় নিদর্শন নয় সে কারণে 'টাই' পরিধান করলে অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ হবে না। তবে ফাসেকদের নিদর্শন হওয়ায় ফাসেকদের সাদৃশ্য তো অবশ্যই হবে। সুতরাং সে হিসেবে টাই পরা এবং এই কাজে সব সময় অটুট থাকা ফিসকের আলামত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু টাই যে, খ্রিস্টানদের ক্রুশ চিহ্ন তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকায়। এই বিশ্বকোষের সর্ব প্রথম সংস্করণে টাই সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তা (টাই) থেকে ওই চিহ্নই উদ্দেশ্য যা পবিত্র ক্রুশ চিহ্নস্বরূপ খ্রিস্টানগণ গলায় পরে থাকে।" সুতরাং হিন্দু ধর্মের নিদর্শন যেমন পৈতা, সেরূপ টাই হলো খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীকি নিদর্শন।

(ডা.যাকের নায়ক এক তাহকীকী জায়েযা,২২৩)

কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নিদর্শন গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয তো আছেই, বরং তা ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও সম্ভ্রমবোধেরও সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুতরাং টুপি সম্পর্কে হাদীস এবং বাস্তব আমলের এত শক্তিশালী দলিল থাকার পরও তা পরিধানে অনুৎসাহিত করা আর টাইয়ের ন্যায় ফিসক ও শিরকের প্রতীকি নির্দশন পরিধানের প্রতি উৎসাহিত করার বাস্তব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী হতে পারে!!! এর ফায়সালা প্রিয় পাঠকবন্ধুদের হাতেই...।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হক্ব বোঝার এবং সে মতে পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

প্রকৃত ইলম অর্জনের চার মূলনীতি-৩

ইখলাস-নিষ্ঠা, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, উচ্চ সাহসিকতা, আদাব ও শিষ্টাচার

মূল : মাওলানা হুযায়ফা দস্তানভী

অনুবাদ : সলিমুদ্দীন মাহদি

শেষ কিস্তি :

আমি ভিক্ষুক হয়ে আসা-যাওয়া করব :

আমি বললাম, আবু আব্দুল্লাহ! আমি প্রথম দফা এই শহরে এসেছি। আমাকে কেউ চেনে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি প্রতিদিন ফকীরের বেশে আপনার নিকট আসা-যাওয়া করব এবং দরজায় সেই আওয়াজই করব, যা তারা করে থাকে। আপনি তাশরীফ আনবেন। যদি প্রতিদিন একটি করে হাদীস শুনতে পারি তা আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন, ঠিক আছে। কিন্তু শর্ত হলো, তুমি মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এবং অন্য কোনো মুহাদ্দিসগণের দরসেও যেতে পারবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তা মঞ্জুর করলাম।

আমার কাজ :

মোটকথা, প্রতিদিন হাতে একটি লাকড়ি নিতাম, মাথার ওপর ভিক্ষুকের মতো কাপড়ের পুঁটলি নিতাম। কাগজ ইত্যাদি আস্তিনে রেখে তাঁর দরজায় গিয়ে ''খোদা বহুত সাদে বাবা'' বলে আওয়াজ দিতাম। সেখানে এভাবেই ভিক্ষার প্রথা ছিল। তিনি তাশরীফ আনতেন। আর তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে কখনো দুইটি কখনো তিনটি হাদীস বা আরো বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন। (সবর ওয়া ইস্তিকামত কে পায়কর : ১৮১-৮২)

প্রিয়ছাত্র বন্ধুরা! লক্ষ্য করুন, বাকী ইবনে মাখলাদের উচ্চ সাহসিকতা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। সহস্র মাইল হেঁটে সফর করেছেন। এবং ভিখারির বেশে ১৩ বছর পর্যন্ত হাদীস অর্জন করেছেন। তাঁর এই উচ্চ সাহসিকতার কারণে সদা-সর্বদা পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আসলাফদেরকে উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এবং আমাদেরকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

৪. আদব-শিষ্টাচার:

ধারাবাহিক মেহনতের সাথে উচ্চ সাহসিকতা, তার সাথে উস্তাজ, কিতাব এবং ইলমের উপকরণের আদব বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। ইমাম ত্বাবারী (রহ.) বলেন,

تواضعوا لمن تعلمون منه

যার কাছ থেকে ইলম অর্জন করবে তার সাথে বিনয় ও আদবের সাথে পেশ হবে।

হযরত থানভী রহ. বলেন, যে পরিমাণ উস্তাদের সাথে মুহাব্বত ও ভালোবাসা হবে ওই পরিমাণ ইলমের মধ্যে বরকত হবে। এটি হলো আল্লাহ তা'আলার আদত-অভ্যাস। উস্তাদ সন্তুষ্ট না থাকলে ইলম আসবে না। (ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত)

হযরত থানভী (রহ.) এটিও লিখেছেন যে, উস্তাদের সম্মান তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। যে তাতে অলসতা করবে সে মুত্তাকি হতে পারবে না। অথচ তাকওয়া বৃদ্ধি পাওয়াটা ইলম বৃদ্ধি পাওয়ার সবব। (আত্-তাবলীগ)

শিক্ষকদের সম্মান :

প্রত্যেক ছাত্রের জন্য জরুরি যে, সে নিজের শিক্ষক মহোদয়কে অত্যন্ত সম্মান করবে। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, আমরা শিক্ষককে এভাবে ভয় করতাম যেমনটি মানুষ বাদশাকে করে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যার কাছ থেকে ইলম অর্জন করবে তার সাথে বিনয়ী হবে।

১. নিজের শায়খকে সবচেয়ে শীর্ষ মনে করবে। হযরত ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.)-এর বাণী, যে উস্তাদের হক্ব আদায় করে না সে কখনো কামিয়াব হবে না।

২. সদা উস্তাদের সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এত বেশি তাঁর পার্শ্বে বসেও থাকবে না যেন তাঁর কষ্ট হয়।

৩.নিজের কর্মকাণ্ড ও পড়াশোনার ব্যাপারে উস্তাদের সাথে পরামর্শ করবে।

৪.লজ্জায় বা অহংকারের বশীভূত হয়ে নিজের সমবয়সী বা বয়সে ছোট উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন থেকে কখনো বিরত থাকবে না। হযরত আসমায়ী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করার লাঞ্ছনা সহ্য করবে না, সে পুরো জীবন লাঞ্ছনা বহন করবে।

৫. উস্তাদের কঠোরতা সহ্য করবে। (এগুলো ''আওজাযুল মাসালিক''এর ভূমিকা থেকে খুব সংক্ষেপে সংকলন করা হয়েছে)

৬.অত্যন্ত প্রসিদ্ধ অতি প্রয়োজনীয় বাণী, ''উস্তাদের অসম্মানি দ্বারা ইলমের বরকত থেকে সদা মাহরুম ও বঞ্চিত থাকে।'' (আপ বীতি : খ২ পৃ : ৪৬)

৭. আল্লাহ তা'য়ালার চিরাচরিত নিয়ম হলো, শিক্ষক মহোদয়কে অসম্মানকারী ব্যক্তি কখনো ইলম দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। যেখানেই কোনো শাস্ত্র পণ্ডিত শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো নীতিমালা লিখেন সেখানে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ ''শিক্ষার্থীদের শিষ্টাচার'' পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন, যা 'আওজাযুল মাসালিক'-এর ভূমিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানেও এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। ইমাম গাযালী (রহ.) 'ইয়াহইয়াউল উলুম' গ্রন্থে সবিস্তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেন, শিক্ষার্থীদের জন্য জরুরি যে, শিক্ষকের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া, এবং বিলকুল সেভাবে আনুগত্য করবে যেমন কোনো

রোগী সদয় ডাক্তারের আনুগত্য স্বীকার করে থাকেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যিনি আমাকে একটি শব্দ শিক্ষা দিয়েছেন আমি তাঁর দাসে পরিণত হলাম। তিনি চাইলে আমাকে বিক্রি করতে পারেন, আবার চাইলে দাস হিসেবে ব্যবহারও করতে পারেন। (এহইয়াউল উলুম: পৃ-৬০)

৮. আমার অভিজ্ঞতা হলো, সাধারণ ইংরেজি শিক্ষায় বা জাগতিক শিক্ষায়ও যদি কেউ আপন শিক্ষকের সম্মান ও হক্ব আদায় করেন তিনিও উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করতে পারেন। বড় বড় পদে সমাসীন হতে পারেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারেন। এবং যারা পাঠ্যকালীন সময়ে শিক্ষকদের সাথে অহংকার ও গর্বের অচারণ করবে পরবর্তীতে ডিগ্রি অর্জন করেও তাদেরকে সুপারিশের জন্য বিভিন্ন জনের দারস্থ হতে হয়। কোথাও কোনো চাকরি পেলেও আপদ-বিপদ লেগেই থাকে। মোটকথা, জ্ঞান যতই হোক না কেন, ওই শাস্ত্রের শিক্ষকমণ্ডলীকে আদব ও সম্মান জানানো ব্যতীত তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। তাঁদের বিরোধিতার তো প্রশ্নই আসে না। (ইয়াহইয়াউল উলুম: পৃ-৬১)

৯.'আদাবুদ্ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন' কিতাবে লিখা আছে, শিক্ষার্থীর জন্য উস্তাদকে তোশামোদ করা এবং তাঁর সামনে বিনয়ী হওয়া জরুরি। যদি এই দুইটি কাজ করো, তাহলে উপকৃত হবে। যদি তা পরিত্যাগ করো তাহলে বঞ্চিত হবে।

লেখক বলেন, স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির অনেক উপকরণ রয়েছে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো শিক্ষক মহোদয়ের জন্য দু'আ করা। যত বেশি দু'আ করবে তত বেশি স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে। (আদাবুদ্ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন, পৃ: ২২)

দারুল উলুম দেওবন্দের এক ফারেগ স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির কৌশল জানতে চাইলেন, তখন বলেছেন, ''আপনার সাথে নিজের প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে যে গভীর সম্পর্ক তাও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপকরণ। ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.)-ইলমের মহা সাগরের মালিক হয়েছেন তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি গুরুত্বর্পূণ কারণ হলো, তিনি পুরো জীবনে কখনো নিজের উস্তাদের ঘরের দিকে পা প্রসারিত করেননি। এবং সে দিকে পা দিয়ে কখনো ঘুমাননি। আজকের সমাজ খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে শায়খ মাদানী (রহ.)-কে স্মরণ করে। তাঁর ইলম ও ফয়জের ধারা অব্যাহতভাবে চলছে। আজ এক সাহেব বলেন, গুজরানোয়ালুতে ''জামইয়্যাতু শায়খিল ইসলাম'' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানো হচ্ছে। এসব কিছুর কারণ হলো, শায়খ মাদানী (রহ.) নিজের উস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর খিদমত করেছেন। এবং তাঁর সাথে মাল্টার বন্দিশালায় গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন। সম্ভাব্য সব খেদমত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। (পৃ: ৮১)

লেখক বলেন, ইলম অর্জন করতে যদি তিনটি বস্তুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় তখন টাট্কা ইলমী যোগ্যতা, এবং রূহানী উন্নতির সমৃদ্ধি সাধিত হবে।

১. শিক্ষকের আদব-শিষ্টাচার ২. মসজিদ ও দরসেগাহের আদব ৩. কিতাবের আদব। (পৃ: ১৪১)

তিনি বলেন, আদব হলো অন্তরের অবস্থা এবং গোপন ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। তাই ইলম অর্জন করা অবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ উস্তাদের মুহাব্বত অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দেবে। তাঁদেরকে মনে-প্রাণে ভালোবাসবে। অথবা এমন কাজ এবং একান্ত মুহাব্বতের প্রকাশ ঘটিয়ে শিক্ষকের অন্তর জয় করবে এবং শিক্ষকের প্রিয় হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রথম অবস্থা তথা, নিজের উস্তাদের সাথে ইশক্ব-মুহাব্বত এবং ভালোবাসায় দিওয়ানা ও পাগল হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থাটি অত্যধিক উপকারী। এমন শিক্ষার্থীরা ইলম অর্জন করতে সক্ষম হয়। এবং তাদের ফয়েজও বেশি ছড়ায়।

তিনি বলেন, মাতা-পিতার খিদমত করলে হায়াতে বরকত হয়। এবং শিক্ষকদের খিদমত করলে ইলমে বরকত হয়। উদ্দেশ্য হল, এই সকল খিদমতের নিজস্ব একেকটি প্রভাব রয়েছে। চিনির নিজস্ব স্বাদ আছে, গুড়ের আছে পৃথক মিষ্টান্নতা এবং মিষ্টির নির্দিষ্ট মজা আছে। যে কোনো খাদ্য বস্তুতে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার এই প্রভাব ও ফলাফল তাকে নিবিষ্ঠ করে রাখে। সুতরাং মাতা-পিতার খিদমত দ্বারা হায়াত বৃদ্ধি পায় আর শিক্ষকের খেদমত দ্বারা ইলম বৃদ্ধি পায় এবং ইলমের খিদমতের প্রভাব এবং ফলাফল হল মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। (পৃ:২৫৯)

পড়ার জন্য যদি শিক্ষক ধরপাকড় করে তা মন্দ মনে না করা। চেহারায় তার কোনো ভাঁজ যেন না পড়ে এবং বিরক্তিও প্রকাশ করবে না। কেননা, তা দ্বারা শিক্ষকের অন্তরে খঠকা লেগে যায়। এবং উপকারের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। এটি অন্তরের প্রশান্তি ও যোগসূত্রের ওপর নির্ভরশীল। উল্লিখিত উভয় অবস্থায় এই দুই বস্তু নেই। অনেক বড় ও দ্রুত উপকারের চাবিকাঠি হলো, যার কাছ থেকে উপকৃত হতে চাই, (সৃষ্টি হোক বা স্রষ্টা) তাঁর সামনে নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে হবে। এবং নিজের সিদ্ধান্ত ও সেচ্ছাচারিতা পরিপূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। অতঃপর দেখবে কত বেশি উপকার হচ্ছে। এটি অনেক বড় কামাল।

যদি কোনো মাসআলায় শিক্ষকের ব্যাখ্যা মনঃপূত না হয় তখন কিছুক্ষণ উপকার হচ্ছে মনে করে হাসিমুখে নিজেই ব্যাখ্যা চিন্তা করবে। তার পরও যদি বুঝে না আসে তখন চুপ থাকবে। এবং মনে মনে বলবে এই বিষয়টি 'তাহক্বীক' ও গবেষণা করব। পরবর্তীতে কিতাব বা বড় বড় ওলামায়ে কিরাম থেকে তাহক্বীক করবে। যদি নিজের সিদ্ধান্ত শুদ্ধ হয় এবং উস্তাদ যদি সত্যসন্ধানী হন তখন ওই কিতাব বা বড় আলেমের তাহক্বীক তাঁর সামনে পেশ করবে। যদি উস্তাদের তাহক্বীক বিশুদ্ধ হয় তখন নিজের ভুলের স্বীকার করবে, বলবে হযরত! আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক, আর আমি ভুলের শিকার হয়েছি। শিক্ষকের বিপরীত হঠকারিতা ও হঠধর্মী এবং মুনাজারা ও বিতর্কের অবতারণা কখনো করবে না। অর্থাৎ চোখ রাঙা করবে না, কথাবার্তায়

রেগে যাবে না এবং কপালে ভাঁজ ফেলবে না। কারণ, বড়দের সামনে এমন করা বেআদবী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের শামিল। (পৃ:৪৮-৪৯)

তালেবে ইলমের কাছ থেকে যদি শিক্ষকের সাথে বেআদবী, নাফরমানী, অথবা কষ্টদায়ক কোনো আচরণ হয়ে যায়, তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেবে। শব্দের অর্থের সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও অপারগতা, বিনয় ও লজ্জা প্রকাশ পেতে হবে। যেনতেন লোকদেখানো ক্ষমা চাওয়া যেন না হয়।

অন্তরে যদি লজ্জাবোধ হয় তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। যদি এটিও না হয় তখন অন্তত কৃত্রিমতা হলেও অবলম্বন করবে। আসল না হলে, অন্তত নকল হলেও করবে। কিন্তু দেরি করবে না। কেননা, উস্তাদ যদি দুনিয়াদার হন, তখন দেরি করার দ্বারা তাঁর অন্তরে মলিনতা বৃদ্ধি পাবে, তাতে তোমার ক্ষতি হবে। আর যদি দ্বীনদার হন, তখন মলিনতা ইত্যাদিকে নিজের অন্তরে স্থান দেবেন না। কেননা, তাঁর লক্ষ্য থাকবে, আয়নার মতো অন্তর সদা যেন আয়নার মতোই থাকে। দুঃখ-কষ্টের যাতনা দ্বারা অন্তরকে আহত হতে দেবে না। কেননা, তরিকতের মধ্যে অন্তরে শত্রুতা ও হিংসা রাখা কুফরী।

কিন্তু স্বভাবজাত কষ্ট এসেই যায়। এবং এটিই তালেবে ইলমের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কেননা, এই অবস্থায় অন্তরের প্রশান্তি থাকে না। আর অন্তরের প্রশান্তি ছাড়া উপকৃত হওয়া যায় না এবং দেরী করার মধ্যে আরেকটি ক্ষতি হলো, যত দেরি হবে তত বাঁধা এসে যাবে। (পৃ: ৫১-৫২)

হযরত আকদাস মুফতি রশীদ আহমদ (রহ.)-এর বাণী:

ইলমী যোগ্যতা সাতটি বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। ১. অন্তর ২. স্মৃতিশক্তি ৩. মেহনত-প্রচেষ্টা ৪. ইলমের উপকরণ, কিতাব, খাতা, কলম এবং টেবিল ইত্যাদি। ৫. শিক্ষকের সম্মান ৬. দু'আ ৭. নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা।

এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো, নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করা। কেননা, ইলমে দ্বীন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ এবং অনেক বড় নেয়ামত। এবং তা এতবড় দৌলত যে, কেবলমাত্র তাকেই প্রদান করা হয়, যে তাঁর প্রত্যেক অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাঁর সাথে মুহাব্বত ও ভালোবাসার প্রমাণ পেশ করবে। (জাওয়াহেরুর রশীদ: খ-১ প";১২১)

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শন:

হযরতজী আসাতেজায়ে কিরামের সাথে যতটুকু সম্পর্ক রেখেছিলেন অন্য কারো সাথে এতটুকু সম্পর্ক ছিল না। এতটুকু বলা যায় যে, তাঁর মধ্যে শিক্ষকমণ্ডলীর 'ইশক্ব' ছিল। তাই তিনি বলতেন, আমি পড়ার সময় এত বেশি মেহনত করিনি। যা কিছু আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন তা আসাতেজায়ে কিরাম ও বুযুর্গদের সাথে সদ্ব্যবহার ও মুহাব্বতের সম্পর্ক রাখার কারণেই দান করেছেন। আল্-হামদুলিল্লাহ! আমি বলতে পারি যে, আমি কখনো কোনো বুযুর্গকে এক মিনিটের জন্যও অসন্তুষ্ট করিনি। আজো আমার অন্তরে বুযুর্গদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা যত আছে হয়তো কারো অন্তরে এত ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।

শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'জাজ আলী সাহেব (রহ.) :

শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই'জাজ আলী সাহেব (রহ.) সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন, কোনো বিষয় জানতে হলে বা কোনো কিতাবের পাঠ আয়ত্ব করতে হলে নিজের উস্তাদ আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ.)-এর ঘরের দরজায় গিয়ে বসে যেতেন। যখন তিনি ঘর থেকে বাইরে যেতেন তখন তা জেনে নিতেন। এটি তার নিত্যদিনের অভ্যাস ছিল। (আদাবুল মুতা'আল্লিমীন, পৃ:২৭)

হযরত মাওলানা মুনাজের হাসান গিলানী (রহ.):

হযরত মাওলানা মুনাজের হাসান গিলানী (রহ.) আপন শিক্ষকমণ্ডলীকে খুবই ভালোবাসতেন। কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তেও তাঁদের আদেশের বিপরীত করার সাহস দেখাতেন না। এবং অজুহাতও তালাশ করতেন না। বরং তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত হতেন।

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের হাত থেকে দেশ স্বাধীন হলো। এর বদৌলতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীর মুখ দেখল। পাকিস্তান নামে নাম করণ করা হলো। শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (রহ.) ইসলামী সংবিধান চালু করার প্রয়াস চালান। এই ইসলামী সংবিধান রচনা করার জন্য অনেক ওলামায়ে কিরামকে করাচিতে জমায়েত করার জন্য চেষ্টা করেন। সেখানে হযরত মাওলানা গিলানী (রহ.)-এর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার অবস্থা বেশি অনুকূলে ছিল না, কিন্তু শিক্ষক মহোদয়ের আদেশের বিপরীত কোনো অজুহাত তালাশ করার সুযোগ নেই। বরং সাথে সাথে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

স্বয়ং মাওলানা সাহেব আল্লামা সুলাইমান নদভী (রহ.)-কে লিখেন, আপনি অংশগ্রহণ করছেন না শুনে আমিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম করাচি যাব না। কিন্তু মাওলানা ওসমানী সাহেবের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক ফোন ও চিঠির কারণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাকেই শ্রেয় মনে করছি। তাঁর শিষ্য হয়ে আমার অন্তর আমাকে ব্যতিক্রম করার অনুমতি দেয়নি। (হায়াতে গিলানী, পৃ: ২৯৪)

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আব্দুল হক সাহেবের ঘটনা :

১. পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হলো, কেবলমাত্র কিতাব পড়ে কেউ ইলমের প্রকৃত ফলাফল লাভ বা পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে না। বরং এর জন্য কামিল মুর্শিদের দারস্থ হতে হয়। এবং শিক্ষকের আদব, সম্মানের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতে হবে। বেআদবী ফুয়ুজাত-বরকত হাসিলের পথে বড় প্রতিবন্ধক। হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.)-এর অন্তরে শিক্ষকমণ্ডলীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং খিদমতের আবেগ সর্বোচ্চভাবে পাওয়া যায়। তাদের খিদমতকে গৌরবের বস্তু মনে করতেন। যদিও তার সহপাঠিরা এই সুযোগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। যেমন শায়খ (রহ.) নিজেই উল্লেখ করেন, আমি স্বয়ং দেওবন্দে ছিলাম। তালেবে ইলমীর

যমানায় হযরত মাদানী (রহ.)-এর নিকট কখনো কখনো খিদমতের জন্য গমন করতাম এবং পা টিপতাম। কিছু কিছু সাথীরা হাসত এবং বলত, এ তো তোষামোদ করছে। কিন্তু এই বুর্যুগদের নেক তাওয়াজ্জুর ফলাফল হলো, আমার মতো অধম থেকেও আল্লাহ তা'য়ালা কিছু না কিছু দ্বীনের খিদমত নিয়েছেন। এবং আরো তাওফীক দিচ্ছেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন এমন সাথীও আছে, যারা বর্তমানে এই রাস্তা পরিত্যাগ করেছে। অতএব ইলমের পুরোটা আদবই আদব। দ্বীনের আদব, শিক্ষকের আদব এবং ইলমের আদব।

(মাহনামায়ে 'আল-হক্ব' হযরতম মাওলানা আব্দুল হক নম্বর : পৃ-৩৩৪)

ইলমের উপকরণ, কাগজ, কলম, কালির আদব এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর অবস্থাঃ

হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) একদিন বাথরুমে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ভেতরে গিয়ে দেখতে পেলেন, আংটির কোনায় এক ফোটা কালি লেগে আছে, যা সাধারণত লেখার সময় গতি দেখার জন্য লাগানো হয়। হঠাৎ ভীত হয়ে বাহিরে বের হয়ে গেলেন। ধুয়ার পর পুনরায় তাশরীফ নিলেন। তিনি বলেন, এই ফোটার সাথে ইলমের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এ জন্য তা নিয়ে হাম্মামে যাওয়া বেআদবী বোঝা যায়। এটি ছিল হযরতের আদব। যার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বর্তমানে পত্রপত্রিকায় কুরআনের আয়াত, হাদীস, আল্লাহর নাম থাকা সত্ত্বেও অলি-গলি, ডাস্টবিন, যত্রতত্রে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় দেখা যায়, নাউযু বিল্লাহ। বর্তমান বিশ্ব এই ধ্বংস ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার মধ্যে বেআদবীর বড় ভূমিকা রয়েছে। (মাজালিসে হাকিমুল উম্মত, পৃ : ২৮১-২৮২)

শব্দ ও অক্ষরের সম্মান :

একটি চামড়ার থলে ছিল। কোনো একনিষ্ঠ খাদিম তা তৈরি করেছেন। ওই চামড়ার মধ্যে "মুহাম্মদ আশরাফ আলী" লিখা ছিল। হযরত থানভী (রহ.) তা এত বেশি সম্মান করতেন যে, যতটুকু সম্ভব নিচে বা যত্রতত্র রাখতেন না। (হুসনুল আযীয: ৪/৩২)

কিতাবের সম্মানঃ

বর্তমানে মানুষের স্বভাবের মধ্যে আদব বিলকুল নেই। মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপূরী (রহ.) লিখেছেন যে, ছাত্রদের জন্য বড় নিন্দনীয় বিষয় হলো, বাম হাতে দ্বীনি কিতাব ও ডান হাতে জুতো নেয়া। কেননা, তা আদবের পরিপন্থী এবং বাহ্যত জুতাকে দ্বীনি কিতাবাদীর ওপর প্রাধান্য দেওয়া। (আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়্যা: ৯/৩২৫)

কালির সম্মান :

একটি খামে কালি পড়ে গিয়েছিল। সেখানে লিখে দিয়েছিল যে, "অনিচ্ছাকৃত কালি পড়ে গিয়েছে।" কারণ বর্ণনা করেছেন, যেন এমন ধারণা না হয় যে, অবহেলা করে ফেলেছে, যা অসম্মানের অন্তর্ভুক্ত। (আল-ফসল লিল্ ওসলি)

যদি পৃথিবীতে ইজ্জত ও আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হও তাহলে নিজের মধ্যে এই গুণগুলো সৃষ্টি করতে হবে।

১. ইখলাছ, ২. অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকা, ৩. ইলম অনুপাতে আমল, ৪. সুন্দর চরিত্রকে জীবনের আবশ্যকীয় অংশ বানিয়ে নেয়া। ৫. বিনয় ও নম্রতা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, ৬. সময়ের মূল্য দেয়া ৭. খেলাধুলা এবং ঘোরাফেরায় নিজের সময় বিনষ্ট করা থেকে মুক্ত থাকা, ৮. রাত-দিন ধারাবাহিকভাবে একেকটি করে মেহনত চালিয়ে যাওয়া, ৯. অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং দ্বীনি কিতাবাদী খুব বেশি অধ্যয়ন করা এবং নিজেকে অধ্যয়নে অভ্যস্ত করে তোলা, যেন অধ্যয়ন ছাড়া মন স্বস্তি না পায়। ১০. তাকবীরে উলার সাথে নামাযের ইহতিমাম করা।

ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) ১৭ বছর ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দরসে ফজরের পূর্বে উপস্থিত হতেন। কখনো তাকবীরে উলা ছুটে যেত না। ইমাম আ'মাশ (রহ.)-এর ৭০ বছর পর্যন্ত তাকবীরে উলা ছোটেনি। এরা সকলে আমাদের জন্য আদর্শ।

১০. শিক্ষক, কিতাব, ইলমের উপকরণ এবং মসজিদের খুবই সম্মান করা। ইলমে নাফের আদবের মধ্যে মসজিদের আদবও অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে কথা বলার কারণে ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ১২. দৃষ্টিকে হিফাজত করা। কুদৃষ্টির কারণে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ১৩.গোনাহ থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকা। কেননা, ইলমের নূর গোনাহের কারণে অর্জিত হতে পারেনা। ১৪. মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকা, কেননা, তা কবিরা গোনাহ। ১৫. সদা দরসে উপস্থিত থাকা। কেননা, একদিনের অনুপস্থিতিও দরসের বরকত নষ্ট করে দেয়। ১৬.দু'আর গুরুত্ব দেওয়া। কেননা, দু'আর কারণে রাস্তা খুলে যায়। বিশেষত 'দু'আয়ে মা'সূরা' মুখস্ত করা। কেননা, তা আল্লাহর নিকট দ্রুত কবুল হয়। ১৭. সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠার ইহতিমাম করা। কেননা, তা বরকতের সময়। দুই-চার রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ে দু'আ করা, অতঃপর পাঠ মুখস্ত করা, ইনশাআল্লাহ অনেক উত্তম কাজ, খুব দ্রুত ইয়াদ হবে। ১৮. বাজারে ঘোরাফেরা না করা। কেননা, তাতে মানুষের ওপর শয়তানের প্রভাব বিস্তৃত হয়। যেহেতু বাজার হলো শয়তানের আড্ডা খানা। ১৯. পড়ার সাথে সাথে নিজেকে লেখায় অভ্যস্ত করা। আরবী, বাংলা, উর্দূতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার অনুশীলন করা। যেন ইলম মানুষের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয়, বিশেষত বর্তমান যুগে তার প্রয়োজন অনেক বেশি। ২০, নাহু, সরফ, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রাথমিক ছাত্ররা বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবে। এবং সমাপনী ছাত্ররা ফিক্বহ, হাদীস এবং তাফসীরের প্রতি বিশেষ যত্নবান হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইলমে নাফে এবং আমলে সালেহের পরিপূর্ণ প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের পূর্বসূরি ওলামায়ে কিরামগণকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমাদের সকলের জন্য ইলমকে নাজাতের উছিলা বানান, যেন তা আমাদের সপক্ষে দলিল হয়, বিপক্ষে নয়। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

(সমাপ্ত)

উদীয়মান কাফেলা

তালেবে ইলমদের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী

☆ ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (দা. বা.) বলেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একজন দ্বীনের ধারক বাহক হিসেবে কবুল করেছেন, সে কারণেই তুমি তালেবুল ইলম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছ। সুতরাং তুমি যেহেতু মাদরাসায় চলেই এসেছ, তাই আদবের সাথে তার মূল্যায়ন কর। তিনি আরো বলেন, ইলম অর্জনে তখনি সফল হবে যখন একাগ্রতার সাথে ইলম হাসিল করা হবে। যে কোনো কাজেই একাগ্রতার সাথে মনোনিবেশ করতে হয়। না হয় সে কাজ পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয় না। তাই যখন তুমি আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অর্জন করবে, তোমার ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা চেতনা সম্পূর্ণভাবে ইলমের মধ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। পড়ালেখা অবস্থায় দুনিয়ার কোনো কাজের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে না।

☆ হযরত আল্লামা তকী উসমানী (দা. বা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সিফাতসমূহের মধ্যে একটি علیم . علم শব্দটি সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো কজের মধ্যে শিরক পছন্দ করেন না। সুতরাং যে কোনো তালেবে ইলম যখন عـــلـــم অর্জন করতে গিয়ে অন্য কোনো বিষয়কে এই ইলমের সাথে জড়িয়ে ফেলে তখন উক্ত তালেবে ইলমের পরিপূর্ণরূপে ইলম অর্জিত হয় না।

☆ হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দা.বা.) বলেন, বর্তমান যুগে কওমী মাদরাসার তালেবে ইলমদের অনেকে নিজেদেরকে অপদস্ত-অবহেলিত মনে করে এবং ভাবিষ্যত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিজেরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। যা আমাদের আকাবিরদের তরীকা ও চিন্তাধারার পরিপন্থী। তালেবে ইলমরা তো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের মেহমান। তালেবে ইলমের মর্যাদা সবার উপরে। কারণ তারাই হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উত্তসূরী। তারাই হবে দ্বীনে ইসলামের কর্ণধার। তারাই হবে হাদিয়ে উম্মাহ তথা জাতির পথপ্রদর্শক। দুনিয়ার কারো প্রতি তারা মুহতাজ নয়। একমাত্র তারা আল্লাহর কাছেই মুহতাজিয়্যাত দেখাতে পারে। সে কারণে কোনো তালেবে ইলম দুনিয়াবী লোভ-লালসা নিয়ে কারো প্রতি মুহতাজিয়্যাত দেখালে তা হবে আসমানী ওহী-ইলমের অবমাননা।

☆ হযরত হারদূয়ী (রহ.) এর মাদরাসা, আশরাফুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীস মুফতী আফজালুর রহমান সাহেব (দা.বা.) বলেন, ইলমের জন্য শর্ত হলো তিনটি। (১) কিতাবের তা'যীম তথা সম্মান করা (২) মাদরাসার তা'যীম করা (৩) উস্তাদের তা'যীম করা। যখন একজন তালেবে ইলম ইলম অর্জনের শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে চলবে, তখন ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। যদি এসকল শর্তের একটিতেও অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তবে ইলম অর্জন করা কঠিন হয়ে যায়।

সংগ্রহে- মুহাম্মদ ইবরাহীম খলীল

কয়েকটি মূল্যবান ঘটনা

কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান :

খ্রিস্টানদের জনৈক ডাক্তার হুসাইন ইবনে আলী ওয়াকেদীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কিতাব কুরআনে তো চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ ইলম দুই প্রকার। ইলমুল আবদান তথা স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান। ইলমুল আদইয়ান তথা দ্বীনের ইলম। হুসাইন ইবনে আলী ওয়াকেদী উত্তরে বলেন, পবিত্র কুরআন পুরো স্বাস্থ্য বিজ্ঞানকে একটি ছোট শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। ডাক্তার বললেন সেটি কোন শব্দ? তিনি বললেন–

كلوا واشربوا ولا تسرفوا

তোমরা পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না। (অর্থাৎ পনাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর)

এরপর ডাক্তার বললেন, আপনাদের নবী কি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলেছেন? হুসাইন ইবনে আলী ওয়াকেদী বলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো পুরো চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এক বাক্যে নিয়ে এসেছেন।

المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء واعط كل بدن ماعودته۔

পাকস্থলি হলো রোগের কেন্দ্র, সতর্কতা হলো সবচাইতে বড় ঔষধ এবং তোমার শরীরকে সেবস্তুই দাও যার অভ্যস্ত তাকে বানিয়েছ।

ডাক্তার এ কথা শুনে বলে উঠলো, তোমাদের নবীতো জালিনুসের প্রয়োজনীয়তা বাকী রাখেননি। (ইলমী জাওয়াহের পারে ১২৪)

হযরত ঈসা আ. এর জবাব:

হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে একটি কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, শয়তান একদিন তাঁকে বললো, আপনার আকীদা হলো, ওইটিই হবে যা আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য

লেখে দিয়েছেন। ঈসা আ. বললেন, অবশ্যই। তখন শয়তান বলল, আপনাকে এই পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে দেখব? যদি আল্লাহ আপনার জন্য নিরাপত্তা লেখে রাখেন তবে নিরপদ থাকবেন। হযরত ঈসা আ. বললেন, অভিশপ্ত! আল্লাহর তো এই অধিকার আছে যে, তিনি বান্দাদের পরীক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বান্দারতো এই অধিকার নেই যে, সে আল্লাহর পরীক্ষা নিবে। (ইলমী জওয়াহের পারে (১৩৩)

হযরত ইউসুফ আ. এর সহানুভূতি :

হযরত ইউসুফ (আ.) নিজে ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় জনসাধারনের সাথে এমন সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন, প্রকৃত পক্ষে তার নজীর পাওয়া মুশকিল। ইউসুফ (আ.) কর্তৃক প্রদত্ত স্বপ্নের তা'বীর-ব্যাখ্যা অনুযায়ী মিশরবাসী সাত বছর খুব সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করার পর যখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়ে গেল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) পেট পুরে পানাহার করা ছেড়ে দিলেন। পেটে ক্ষুধা রেখে দিতে লাগলেন। বিভিন্ন লোক তাঁকে বলল, হে মিসরের বাদশাহ, রাষ্ট্রীয় পুরো কোষাগার আপনার করায়ত্বে আছে কিন্তু আপনি পেটপুরে খাননা কেন? তখন তিনি বললেন, আমি এটা একারণে করি যাতে সাধারণ লোকের ক্ষুধার কথা আমি অনুভব করতে পারি এবং তাদের কথা আমার অন্তর থেকে চলে না যায়। তিনি শাহী দরবারের বাবুর্চিদেরকেও নির্দেশ দিলেন তারা যেন দিনে শুধু একবার দুপুরের খাবারই রান্না করে। যাতে শাহী দরবারের সকলে অভুক্ত জনসাধারণের সাথে অংশ নেয় এবং তাদের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করে। (মা'আরেফুল কুরআন ৫/৯৩)

পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর :

হযরত শফীক ইবনে ইবরাহীম (রহ.) বলেন, আমি সাতশ' আলেমের কাছে এমন পাঁচটি প্রশ্ন করেছি সকলে যেগুলোর এক ও অভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

(১) জিজ্ঞেস করলাম 'আকল ওয়ালা' কে? সকলে উত্তর দিয়েছেন, আকল ওয়ালা হলো যারা দুনিয়াকে ভালবাসে না।

(২) জিজ্ঞেস করলাম 'হুশিয়ার বা চালাক' কে? জবাব দিলেন, যাকে দুনিয়া ধুকা দিতে পারে না।

(৩) বললাম, গণী বা সম্পদশালী কে? উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্টিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

(৪) প্রশ্ন করলাম, ফক্বীহ কে? উত্তর দিলেন, যে অতিরিক্ত চায় না।

(৫) জিজ্ঞেস করলাম, বখীল তথা কৃপণ কে? উত্তর দিলেন, যে লোক নিজের সম্পদ থেকে আল্লাহর বাতলে দেওয়া হক্ব আদায় করে না। (তাম্বিহুল গাফিলীন)

সংগ্রহে : মাওঃ হাফেজ নজরুল ইসলাম

মতের জোয়ার

আলোর দিশারী 'মাসিক আল-আবরার'

বর্তমান জামানায় অশ্লীলতার সয়লাবে পুরো মুসলিম দুনিয়া যেন অন্ধকারের এক অতল গহবরে নিমজ্জিত হতে চলেছে। অশ্লীলতা যেন একের পর মুসলিম সমাজকে গ্রাস করেই চলছে লাগামহীনভাবে। এহেন পরিস্থিতিতে জাতিকে কুশিক্ষা থেকে সুশিক্ষা, অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অন্যায় থেকে ন্যায়ের পথে, অসৎ পথ থেকে সৎ পথে আনার জন্য মাসিক আল-আবরার আলোর দিশারী হিসেবেই কাজ করছে।

মাসিক আল-আবরারের প্রথম সংখ্যা থেকে সবকটি সংখ্যা আমি সংগ্রহ করেছি। মাশাআল্লাহ পত্রিকাটির বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ জাতীয় জীবনে মুসলমানদের অনেক ফায়দা বয়ে আনবে। বিশেষ করে একটি সংখ্যায় পবিত্র কুরআনকে বাংলা উচ্চারণে পড়ার ব্যাপারে কুরআন বিকৃতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা আম জনগনের খুব উপকার হয়েছে। এদেশসহ বিভিন্ন দেশের জন্য বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্যভাষায় কুরআনের উচ্চারণ লেখা হয়। তা যে কত বড় ভুল মুসলমানগণ সে সম্পর্কে অজ্ঞই বলা চলে। তাই মাসিক আল-আবরারের ওই প্রবন্ধটি অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে। তা ছাড়াও আমি নিয়মিত কোয়ানটাম মেথডের ধারাবাহিক আর্টিক্যালটি পাঠ করি। খুব ভাল লাগে। মনে হলো এব্যাপারে বেশি লেখালেখি হয়নি। যার কারণে সে ব্যাপারে আগে আমাদের ধারণা ছিল না। এটি কতবড় জঘণ্য পরিকল্পনা মুসলিম সমাজে বাস্তবায়িত হচেছ তা আমি মাসিক আল-আবরার থেকেই জেনেছি। এটি মুসলমানদেরকে ঈমান হারা করারই একটি নীল নকশার বাস্তবায়ন বলে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস আবরার কর্তৃপক্ষ লেখাটি গুরুত্বের সাথে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাবেন। এছাড়াও বিভিন্ন নতুন নতুন মাসআলা যথা, জেলেটিনের শরয়ী হুকুম, মাল্টিলেভেল মার্কেটিং, শেয়ারের যাকাত, কওমী মাদরাসা ইত্যাদি নিয়ে দলীল ভিত্তিক যেসমস্ত লেখা মাসিক আল-আবরারে পেলাম সবই জাতীয় জীবনে মুসলমানদের বহুবিদ উপকার বয়ে আনার মত।

এ কারণে আমি নিজে পত্রিকাটি পড়ি। দেখা গেছে অনেকে আমার কাছ থেকে পত্রিকার কপি নিলে আর ফেরত দেয় না। তাদেরও নাকি পত্রিকাটি ভাল লাগে। তা শুনে অবশ্য আমার মন আপ্লুত হয়। কারণ আমার ভাল লাগা আর তাদের ভাল লাগা একত্র হলে নিজের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

মাসিক আল-আবরারের এ অগ্রযাত্রা কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকুক, মাসিক আল-আবরারকে মুসলমানদের সকল দূর্দিনে হক্ব ও সঠিক কথার মুখপাত্র হিসেবে আল্লাহ তা,আলা কবুল করুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ

তারানা

সবি প্রভূর প্রতিদান
- মুহাম্মদ নাজমুল হক্ব বগুড়বী

এই পৃথিবীর মালিক তুমি
প্রভূ তুমি অসীম মহিয়ান।
তোমার করুণায় সৃষ্টি
হয়েছে বিশ্ব এ জাহান।
শস্য শ্যামল ফসল
মাঠ ভরা ধান।
প্রভূ এই তো সবি
তোমার প্রতিদান।
তোমার আদেশ পেয়ে পূবে
সূর্য জেগে উঠে।
পশু পাখি তার উদয়ে
স্মরে তোমার নাম।
পাহাড় পর্বত বৃক্ষ লতা
সাগর জমি আসমান,
বৃষ্টি বাদল, ঝর্ণাধারা
ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ।
সবি প্রভূ তোমার প্রতিদান
তাইতো তুমি রহীম ও রহমান।

প্রভূর দরবারে
মুহাম্মদ ইয়ার হুসাইন

আল্লাহ তুমি অনেক বড়
বিশ্বের অধিপতি
সবার উপর ধরে রাখ
রহমতের ছাতি।
খাদ্যহীনের দাওগো খাবার
দুঃখী জনের সুখ।
মায়ের কোলে তুলে ধর
চাঁদের মত মুখ।
আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য
করেছো মোদের দান।
তুমি বিশ্ব পালক বাদশার বাদশা
প্রভূ দয়াবান।

এগিয়ে যাবে (ইনশাআল্লাহ)
আব্দুল হাকীম (ফাহিম) যশোরী

সত্যজ্ঞানের পথিক মোরা
নেই কো মোদের ভয়।
যতই আসুক বাঁধার প্রাচীর
সবি করবো জয়।
জীবন চলার পথে অনেক
আসবে বাঁধা ঠিক।
মন্দ লোকে পিছন থেকে
দিতেও পারে ধিক।
আমরা তবু এগিয়ে যাবো
কান দেবো না তাতে।
চিন্তা কিসের ঐ কাফেলার
আল্লাহ যাদের সাথে।

জামি'আতুল আবরার
মুহাম্মদ মুখতার হুসাইন কুমিল্লা

এই জামি'আতুল আবরার
ইলমে নববীর ঝর্ণাধারা।
ছুটে নববী জ্ঞান আহরণে
দুর দুর থেকে শত পিপাসুরা।
আফতাব যেখানে হয় উদয়
আঁধার কেটে করে আলোকিত
সেই আফতাবেরই এ ফোয়ারা
এর সংসর্গে কাটে জাহিলিয়াত।
আল্লাহু জিকিরের শত গুঞ্জনে
এখানে প্রতিদিন সূর্য উঠে।
আল্লাহ ও রাসূলের স্মরণে
এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা নামে।
এখানে নূরানী এক পরিবেশ
গড়ে উঠে অনন্য আবেশ।
যার নামে এই মহাকানন
তিনি হযরত মুহিউসসুন্নাহ।
এই বাগানের মালি যিনি
তিনি হলেন ফক্বীহুল মিল্লাহ।

আদর্শ রাহবার
হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা

মুহাম্মদ মাহমূদুল হাসান

ফ ফল-ফলাদির এই ভুবনে তুমি যে, লোকমান
তোমার জ্ঞানের দীপ্ত শিখায় জ্বলবে চিরন্তন।
ক্বী ক্বীমত তোমার এই জগতে স্বর্ণ সমমান
তুমিই হলে ধরার বুকে কুতবে জামান।
হু হুসনে সীরাতের ধারক তুমি নেই তোমার জুরি
তুমি হলে মহানবীর আদর্শর অনুসারী।
ল লকব তোমার মুফতিয়ে আজম এ ধরণীর পীঠে
বাতিলের বিরুদ্ধে লড়েছ তুমি পথে-ঘাটে আর মাঠে
মি মিসকীন অসহায়দের জন্য তুমি হাতেম তাঈ
তুমি হলে এই যামানায় দ্বীনের আদর্শ দাঈ।
ল লড়েছ তুমি বিদআতের বিরুদ্ধে দূর করতে বিদআত
বিদআতকে হটিয়ে তুমি কায়েম করেছ সুন্নাত।
লা লাল মাটির এই বসুন্ধরা ছিল মরুভূমি
তোমার পরশ পেয়ে হল স্বর্নের মত দামী।
ত তব নামে লিখে দিবেন খোদা উত্তম পুরষ্কার
তুমি হলে পথহারা জাতির আদর্শ রাহবার।
মু মুর্শিদে যামান তুমি, তুমি জাতির কাণ্ডারী
তুমি হলে আকাবিরের আদর্শ উত্তর সূরী
ফ ফরিয়াদ জানাই তোমার কাছে আমরা সকলে
আমাদেরকে পর ভেবে দূরে দিয়োনা ঠেলে।
তী তীক্ষ্ণ জ্ঞানের ধারক তুমি নেই যে তোমার তুলনা
মারকায, আবরার, আশরাফিয়া সে জ্ঞানেরই নমুনা।
আ আল্লাহ তোমার দরবারে মোরা ফরিয়াদ জানাই
হযরত ওয়ালার রূহানী ফয়েজ আমরা যেন পাই।
ব বলব কি আর হযরতের শানে তিনি যে মহান
তাঁর ইশারায় করেতে পারি জীবনও কুরবান।
দু দুআ করি দরবারে তোমার হে মহিমাময়
হযরত ওয়ালার হায়াতে তাইয়েবা বৃদ্ধি যেন পায়।
র রহমানের রহমত রূপে এসেছ তুমি এ ভুবনে
তুমি বিনে আমরা সবাই এতীম হব এ কাননে।
র রহমান ওগো তোমার কাছে জানাই ফরিয়াদ
ঈমানের সাথে শেষ করিও হযরতের হায়াত।
হ হযরতের কবরখানা বানিয়ে দিও জান্নাতের বাগান
থাকে যেন ঐ কাননে হুর পরিদের নিয়মিত তান।
মা মালিক ওগো তোমার কাছে আর্তনাদ জানাই
জান্নাতুল ফিরদাউস যেন হয় হযরতের ঠাই।
ন নতশিরে তোমার কাছে করি মোনাজাত
হযরতের ফয়েজে তুমি মোদের দিও নাজাত।

খবরাখবর

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর পবিত্র উমরা পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

প্রতিবেদক : মাওলানা ক্বারী জসীমুদ্দীন কাসেমী

গত ১৮ জুন ২০১২ইং মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনার পর হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) নিজের ওপর ভর করে কিছুই করতে পারছিলেন না। পায়ে ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে দীর্ঘ সফর তো দূরের কথা, হাঁটতে-চলতে এমনকি দাঁড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়েন। দেখতে দেখতে আগমন ঘটল পবিত্র মাহে রমাজানের। চতুর্দিকে গুঞ্জন ছিল হুজুর এ বছর ওমরা পালন করতে পারবেন কি না! ডাক্তারগণও দীর্ঘ সফরের কোনো প্রকার অনুমতি দিচ্ছিলেন না। কিন্তু যিনি প্রত্যেক রমাজানেই আল্লাহর ঘর পবিত্র মক্কাতুল মুকাররামায় হাজিরা দিয়ে থাকেন, মহনবী (সা.)-এর রওজায়ে পাকে গিয়ে নবী (সা.)-এর প্রতি সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন, শেষ দশ দিন যিনি নববী মসজিদের মুসল্লী, মুতাকিফ এবং নবীজির মেহমান হয়ে থাকেন, তিনিই জানেন এবারের রমাজানের দিনগুলোতে তাঁর অন্তরে কিরূপ ঝড়ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ পাকেরই কারিশমা ২০ রমাজান থেকে শোনা যাচ্ছিল হুজুর এবারও পবিত্র উমরা পালনে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হলেও মক্কা শরীফ সফর করবেন। এই মহান ব্যক্তি এহেন মা'যুর অবস্থায় আল্লাহর অপার রহমতে ২৩ রমাজান প্রাণপ্রিয় মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। উমরা পালন শেষে ২৮ রমাজান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সফরে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী সাহেব।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর পরিচালনাধীন মাদরাসাসমূহের ভর্তিকার্যক্রম সম্পন্ন

এ দেশের শীর্ষ মুরুব্বী ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মুফতী আব্দুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম) কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাসমূহের ভর্তির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক মাদরাসার শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্ট অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রমের কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

জামিল মাদরাসা বগুড়া :

বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত উমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামি'আ ইসলামিয়া কাসেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। এটি বাংলাদেশের একটি কেন্দ্রীয় মাদরাসা হিসেবেও খ্যাত। এ দেশের সর্ববৃহৎ কওমী বোর্ডসমূহের অন্যতম "তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়্যা"-এর কেন্দ্রীয় অফিস অত্র মাদরাসাতেই প্রতিষ্ঠিত। এখানে নাজেরা বিভাগ, হেফজ বিভাগ, কিতাব বিভাগে প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে দাওরায়ে হাদীস এবং উচ্চশিক্ষা-ইফতা বিভাগ, তাফসীর বিভাগ, তাজবীদ বিভাগ ও আরবী সাহিত্য বিভাগ ইত্যাদিতে সুচারুরূপে পাঠ দান করা হয়। এবার ১৪৩৩-৩৪ হিজরী শিক্ষা বর্ষে অত্র জামেয়ায় তিন হাজারের মতো ছাত্র ভর্তি হয়েছে বলে শিক্ষা বিভাগীয় রিপোর্টে জানা গেছে।

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ :

"মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা" এ দেশের এক অনন্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অত্র মারকাযে মিশকাত, দাওরা এবং উচ্চশিক্ষা-ইফতা বিভাগ, হাদীস বিভাগ, তাফসীর বিভাগ এবং তাজবীদ বিভাগে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত জামিয়া থেকে সনদপ্রাপ্ত উস্তাদগণের অধীনে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে অত্র মারকাযে প্রায় সাড়ে সাত শ'র মতো ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে বলে বিভাগীয় রিপোর্ট সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়াও হেফজ বিভাগে ৫০ জনের মতো ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এ বছর দেড় হাজারের মতো ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইপূর্বক সর্বোচ্চ যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতেই ছাত্রদের ভর্তি করা হয়।

সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স বাংলাদেশ :

বিশ্বব্যাপী সুদভিত্তিক অর্থনীতির সয়লাবে মানবতা যখন তলিয়ে যেতে লাগল এক অন্ধকারাচ্ছান্ন অনিশ্চিত গন্তব্যের অতল গহবরে, পুঁজিপতিদের পুঁজির শোষণে আর্তমানবতার গলগণ্ডের পানি যখন শুকিয়ে যেতেই আরম্ভ করল তখন মুসলিম বিশ্বের ইসলামিক স্কলাররা নতুন করে শোষণহীন, সুসম ইসলামী অর্থব্যবস্থার কথা ভাবতে আরম্ভ করল। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নামে গড়ে উঠল কতিপয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তখনও উলামায়ে কেরামের সঠিক অভিভাবকত্ব না থাকায় পুরোপুরি ইসলামিক ফাইন্যান্স ও অর্থব্যবস্থা চালু করতে প্রতিষ্ঠানগুলো বলতে গেলে শুধু ব্যর্থই হচ্ছিল না বরং রীতিমতো যে সুদ থেকে পরিত্রাণের জন্য এতসব আয়োজন স্বয়ং সে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে পৃথক করে নিরেট ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করবে এরূপ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কর্মপন্থাও তৈরি করতে পারছিলেন না তাঁরা। তৎকালীন দ্বীনের কর্ণধারগণ তাঁদের এহেন ব্যর্থতা দেখে আধুনিক যুগের পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিবেচনায় ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপরেখা তৈরিতে মনোনিবেশ করলেন। উলামায়ে কেরামের দীর্ঘ গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার ফলশ্রুতিতে এমন বেশ কিছু তত্ত্ব উপাত্ত সংগৃহীত হয়, যা দ্বারা মোটামোটি একটি রূপরেখা দাঁড় করা যায়। সে ভিত্তিতে পাকিস্তানে হযরত মাওলানা তকী

উসমানী সাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) শুধু ইসলামী অর্থনীতি গবেষণাকেন্দ্র নামে একটি অনন্য উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খুব কম সময়ে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রদানে সক্ষম হয়। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব থেকে উপকৃত হচ্ছে দুনিয়ার বহু আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

নিকট অতীতেও বাংলাদেশে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ধারা লালিত হয়নি কারো অন্তরে। হয়তো অন্তরের মণিকোঠায় এরূপ চিন্তাধারা জাগ্রত থাকলেও বাস্তবায়িত করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর বাংলাদেশের শীর্ষ মুরব্বী ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) এহেন মহৎ চিন্তাচেতনা নিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশে ২০০৪ইং সালে তাখাসুস ফিল ইকতিসাদিল ইসলামী নামে পৃথক একটি উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি গবেষণা বিভাগের গোড়াপত্তন করেন। অত্র বিভাগের ক্রমবিকাশ ধারায় হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর একক উদ্যোগে "সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিক্স" নামে উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি গবেষণার এই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটি গত ২০০৯ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে দু'বছর মেয়াদে ৬ সেমিস্টারে ইসলামী অর্থনীতির উপর উচ্চতর গবেষণার সুযোগ রাখা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে ২৫ জনের মতো ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

শুলকবহর মাদ্রাসা চট্টগ্রাম :

চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র শুলকবহর এলাকায় অবস্থিত কাশেফুল উলূম "শুলক বহর মাদ্রাসা" দেশের একটি নির্ভরযোগ্য ও মকবূল মাদরাসা। অত্র মাদরাসায় নাজেরা বিভাগ, হেফজ বিভাগ, কিতাব বিভাগে প্রাথমিক থেকে আরম্ভ করে দাওরায়ে হাদীস এবং উচ্চশিক্ষায় ইফতা এবং তাজবীদ বিভাগ রয়েছে। আবার কিতাব বিভাগে মুতাফাররাকা নামে একটি বিশেষ বিভাগও চালু রয়েছে। অত্র মাদরাসার সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় রিপোর্ট অনুযায়ী পনের শ'র মতো ছাত্র বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ভর্তি করা হয়েছে।

জামি'আতুল আবরার :

রাজধানী ঢাকার বসুন্ধরা রিভারভিউতে আজ থেকে মাত্র ৭ বছর পূর্বে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর শায়খ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর ইশারা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল জামিআতুল আবরার নামে এক ব্যতিক্রমধর্মী ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রথম বছরেই এই জামিয়াতে জামা'আতে মীযান থেকে মিশকাত পর্যন্ত পাঠ আরম্ভ হয়ে যায়। দেখতে দেখতেই মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে এটি একটি দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে তথায় হেফজ বিভাগ এবং কিতাব বিভাগে জামা'আতে মীযান থেকে আরম্ভ করে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত নিয়মিত বিভাগ জারি রয়েছে। আবার কিতাব বিভাগে মুতাফাররাকা নামে একটি বিশেষ বিভাগও চালু রয়েছে। এ বিভাগে শুধুমাত্র হাফেজ ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছয়শতাধিক ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে বলে জানানো হয়।

মাদীনাতুল উলূম মাদরাসা বসুন্ধরা :

ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পেই রয়েছে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম)-এর তৃতীয় আরেকটি মাদরাসা মদীনাতুল উলূম মাদরাসা। এতে হেফজখানাসহ প্রাথমিক স্তর থেকে হেদায়া জামা'আত পর্যন্ত রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে আড়াই শ'র মতো ছাত্র উক্ত মাদরাসায় ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুর :

ঢাকার পরিচিত স্থান গাজীপুরে হজরতের প্রতিষ্ঠিত আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম "আশরাফিয়া মাদরাসা গাজীপুর।" এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠার আজ মাত্র ৪ বছর। এখানে হেজফখানাসহ কিতাব বিভাগে প্রাথমিক স্তর থেকে মিশকাত জামা'আত পর্যন্ত মোট আড়াই শ'র মতো ছাত্রের ভর্তির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রত্যেক মাদরাসার নিয়মিত পড়া-লেখা গত ৬/৯/২০১২ পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেছে। মারকাযে ৬/৯/২০১২ তারিখ সোমবার হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) নিজেই ইফতিতাহী সবক পড়ান এবং দু'আ করেন। গত ৬-০৯-২০১২ইং তারিখে চট্টগ্রামের শুলকবহর মাদরাসা থেকে উসতাদ ও ছাত্রগণ ঢাকায় এসে ইফতিতাহী দরস নেন।

উল্লেখ্য, হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর এ পর্যন্ত কোনো মাদরাসায় যেতে পারেননি। মাদরাসাগুলোর ভর্তিসহ যাবতীয় বিষয়ে পরামর্শের জন্য প্রত্যেক মাদরাসার মজলিসে ইলমীর সদস্যগণ গত ২৫-৮-২০১২ তারিখ থেকে ২৮-৮-২০১২ পর্যন্ত ভিন্নভিন্নভাবে হুজুরের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। হুজুরের সরাসরি দিকনির্দেশনা মতেই সকল মাদরাসার ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এক বার্তায় হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত (দামাত বারাকাতুহুম) ভর্তি কার্যক্রম সুসম্পন্ন হওয়ায় সকল মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি শোকরিয়া আদায় করেন এবং সকল ছাত্র-শিক্ষকদের পড়া এবং পড়ানো আল্লাহর কাছে কবুলিয়্যাতের দু'আ করেন।

তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়্যা আল-ক্বওমীয়া বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ-১৪৩৩হিঃ/২০১২ ইং

তানযীমুল মাদারিসিদ দ্বীনিয়া আল-ক্বওমীয়া (ক্বওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)-এর অধীনে অনুষ্ঠিত ১৮তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফল ১৬/০৯/১৪৩৩হিঃ মোতাবেক ০৫/০৮/২০১২ইং সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির উপস্থিতিতে বোর্ডের কেন্দ্রীয় দফতর, জামিয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়ায় তানযীমের নব নির্মিত ভবনে প্রকাশিত হয়। এ বৎসর বিভিন্ন স্তরে সর্ব মোট প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন জামায়াতের মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত ছাত্রদের আংশিক তালিকা (১ম, ২য় ও ৩য়) দেয়া হল।

☆ **দাওরায়ে হাদীস :** সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে মো. মাসউদুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৯৬৪, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। দ্বিতীয় মো. আল আমীন, প্রাপ্ত নম্বর ৯৪৫, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. মাহমুদ হাসান, প্রাপ্ত নম্বর ৯৪০, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। (পাসের হার-৫৯%)

☆ **মিশকাত জামা'আত :** প্রথম স্থান মো. আনিছুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮১, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। দ্বিতীয় মো. হাসান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫০, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৪০, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।
(পাসের হার-৬২.৬২%)

☆ **চাহারম জামা'আত :** প্রথম স্থান মো. শহিদুল্লাহ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮১, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। দ্বিতীয় মো. আহসান হাবীব, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫৭, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. ফোরকান মাযহারী, প্রাপ্ত নম্বর ৬৪৮, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।
(পাসের হার-৮০%)

☆ **শশম জামা'আত : প্রথম** স্থান মো. শফিউল আলম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৭১, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। দ্বিতীয় মো. আলাউদ্দিন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৪, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. শামছুল হক, প্রাপ্ত নম্বর ৬৬০, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া।
(পাসের হার-৮০.৬৫%)

☆ **হাশতম জামা'আত :** প্রথম স্থান মো. মাসউদুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৭, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। দ্বিতীয় মো. যোবায়ের আহমাদ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৪, জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম কারবালা মাদরাসা, বগুড়া। তৃতীয় মো. সৈয়দ আলী, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩, জামেয়া আরাবিয়া শামছুল উলুম কারবালা মাদরাসা, বগুড়া। তৃতীয় মো. মু'আজ আহামদ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৩, আল জামেয়াতুল করীমিয়া নুরুল উলুম জুম্মাপাড়া, রংপুর।
(পাসের হার-৭৮%)

☆ **নাহুম জামা'আত :** প্রথম স্থান মো. শওকত মাহমুদ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। প্রথম স্থান মো. আব্দুল ওয়াহহাব, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। প্রথম স্থান মো. নূর হোসাইন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। দ্বিতীয় মো. আরিফুল ইসলাম, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। তৃতীয় মো. যোবায়ের হোসেন, প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৯, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. আবু ইউসুফ, প্রাপ্ত নম্বর, ৬৮৯, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। (পাসের হার-৮০.৮৮%)

☆ **দাহুম জামা'আত :** প্রথম স্থান মো. মোস্তাকিম বিল্লাহ, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২, এমদাদুল উলুম মোলামগাড়ী মাদরাসা, শিবগঞ্জ। দ্বিতীয় মো. মাসউদুর রহমান, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯১, জামিয়া হুসাইনিয়া খুকনী, সিরাজগঞ্জ। তৃতীয় মো. গোলাম কিবরিয়া, প্রাপ্ত নম্বর, ৬৯০, জামেয়া ইসলামিয়া কাছেমুল উলূম (জামিল মাদরাসা) বগুড়া। তৃতীয় মো. আব্দুন্ নূর, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০, জামেয়া আরাবিয়া নিউটাউন, দিনাজপুর। (পাসের হার-৯১.৫৫%)